-ঐতিহাসিক ও দার্শনিক আলোচনা-

স্বামী অভেদানন্দ

It isn't cover banglabooks.in

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

ভারতীয় সংস্কৃতি
আত্মবিকাশ
যোগশিক্ষা
আত্মজ্ঞান
কর্ম-বিজ্ঞান
স্তোত্ররত্নাকর
হিন্দুনারী
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম
পত্রসংকলন

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

তীর্থরেণু (স্বামী অভেদানন্দের ক্লাস-লেকচার ও তাঁর দার্শনিক মতবাদ)
শ্রীদুর্গা (দেবী দুর্গার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা)
ধ্রুপদমালা (গান ও স্বরলিপির পুস্তক)
রাগ ও রূপ (সংগীতে রাগের ক্রমবিকাশ এবং ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর পরিচয়)
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা (জীবন ও বাণী)

স্বামী শংকরানন্দ প্রণীত

জীবন-কথা (স্বামী অভেদানন্দের জীবন-চরিত)
শ্রীরামকৃষ্ণচরিত (জীবন ও বাণী)

পুনর্জন্মবাদ

-ঐতিহাসিক ও দার্শনিক আলোচনা—

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা

সূচীপত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

'পুনর্জন্মবাদ' স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ইংরাজী *Reincarnaton* পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই বইখানির বিষয়বস্তু বক্তৃতার আকারে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই বইখানিই সর্বসাধারণে প্রচারের জন্য সর্বপ্রথম ছাপার আকারে প্রকাশিত হয়। মূল ইংরাজী বইখানির বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পুস্তকের আলোচনা সহজ সরলভাবে পাঠকদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য একটী 'পরিচিতি' লিখিয়া তিনি এই পুস্তকে সংযুক্ত করিয়াছেন। পুস্তকের মধ্যে ইংরাজী কবিতাগুলির অনুবাদ করিয়াছেন স্বামী বেদানন্দ। *Life Beyond Death* নামে স্বামিজীর যে বিখ্যাত বইখানি আছে বিষয়বস্তুর দিক হইতে তাহা এই পুস্তকেরই পরিপূরক গ্রন্থ। জিজ্ঞাসু পাঠকদের তাহা অধ্যয়ন করা উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
কার্ত্তিক, ১৩৫৩

প্রকাশক

পরিচিতি

পুনর্জন্মতত্ত্ব জানিবার আগ্রহ ও কৌতুহল সকলেরই আছে। সংসারের দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মানুষ শান্তিময় জীবন পাইবার জন্য পরলোকের দিকে তাকাইয়া থাকে, চিন্তা করে যে, বর্তমান জীবন শোক-দুঃখময় হইলেও আত্মার যদি অস্তিত্ব থাকে, আমাকে যদি পুনরায় পৃথিবীলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে পরজন্মে অবশ্যই আমি আনন্দময় জীবন লাভ করিতে পারিব। বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে পুনর্জন্মতত্ত্ব জানিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত ও উৎসুক করে। এই আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে পার্থিব ভোগস্পৃহা প্রবলভাবে থাকে। অধিকাংশ মানুষ চায় বাধা-বিপত্তিহীন নির্বৈর জীবনে কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের দ্বারা আনন্দ লাভ করিতে, অথচ সেই আনন্দ যে শাশ্বত নয়—ক্ষণিক, একথা সে বিবেক-বুদ্ধির অভাবে বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারে না বলিয়াই জীবনের অমর অস্তিত্ব সে কামনা করে কেবল ভোগ করিবার জন্য। অথচ আত্মা যে আমাদের সত্যই মরণশীল ও জন্ম-মৃত্যুগামী নয়, একথা জ্ঞানিগণের মুখে শুনিয়া এবং শাস্ত্রে পড়িয়াও মানুষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। বর্তমান জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়া পুনর্জন্মে তাহা পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইলেও মায়ার আবরণ তাহাকে ঘেরিয়াই থাকে, এই মায়ার মলিন আবরণ থাকার জন্য বিদেহী আত্মা পরজন্মে পৃথিবীবাসী হয় ও দুঃখ-কষ্টের পুনরাভিনয়ের অংশ গ্রহণ করে। দুঃখ-কষ্টের তাহার আর অবসান হয় না এবং অবসান হয় না বলিয়াই পৃথিবীতে যাতায়াত বা জন্ম-মৃত্যু-চক্রের গতি তাহার কখনও বন্ধ হয় না, অবিশ্রান্ত ভাবে তাহা চলিতেই থাকে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই 'পুনর্জন্মবাদ' বইথানিতে বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মানুষের আত্মা শাশ্বত জন্ম-মৃত্যুহীন পরমচৈতন্য স্বরূপ হইলেও বিদেহী মায়াময় আর একটি আত্মার অস্তিত্ব আছে। যদিও সে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনাও সম্পূর্ণরূপে ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহাকে জন্ম-মরণশীল বিদেহী আত্মা বলি তাহাকে ভারতীয় দর্শনে 'সূক্ষ্মদেহ' ও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে 'সাইকি' বা 'সোল' (*psyche* বা *soul*) বলা হইয়াছে। এই সূক্ষ্মদেহ বা সাইকির স্বরূপ সতেরটি অবয়বের সমষ্টি: পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি। রক্ত-মাংসের জড়শরীর মৃত্যুর পর ধ্বংস হইয়া যায়, থাকে মাত্র সতেরটি অবয়বযুক্ত আত্মা বা আতিবাহিক সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্মশরীরই পরলোকগামী হয়, কিন্তু সূক্ষ্মশরীরের অধিষ্ঠানরূপী পরমচৈতন্য আত্মার কোন যাতায়াত বা বিকার নাই। মানুষের অন্তঃকরণ অসংখ্য অতীত জন্মের পুঞ্জীভূত সংস্কারের সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নয়। সংস্কারই অদৃষ্ট বা প্রাক্তনের আকারে মানুষের সৎ ও অসৎ—ভাল ও মন্দ কর্মের অনুযায়ী ফল বিধান করে। এই কর্মফলের বিধানকর্তা ভগবান বা পরমেশ্বর নন। ঈশ্বর প্রদীপের ন্যায় নিস্পৃহ, উদাসীন ও সাক্ষীচৈতন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিয়াছেন: একটি প্রদীপের পার্শ্বে একজন বসিয়া ভাগবতগ্রন্থ পাঠ করিতেছে ও অপর একজন দলিল জাল করিতেছে। এক্ষণে ভাগবত পাঠ করার জন্য পুণ্য ও দলিল জাল করারূপ অন্যায় কাজ করার জন্য পাপ ভোগ করে ভাগবত পাঠ যে করিতেছে এবং দলিল জাল যে করিতেছে তাহারা; নিজের নিজের কৃত কর্মই তাহাদিগকে ভাল ও মন্দ ফল প্রদান করে, এই ফলপ্রদানের জন্য প্রদীপ কথনই দায়ী হয় না। সেইরূপ ঈশ্বর সাক্ষীমাত্র। তিনি মানুষকে বা কোন প্রাণীকে কথনও ভাল বা মন্দ ফল দেন না, সকলেই যে যাহার কর্ম অথবা

সংস্কারের অনুযায়ী ফল লাভ করে। দেহান্তর গমনের জন্য সূক্ষ্মদেহী আত্মার সংস্কার দূরীভূত হয় না, বরং শুভাশুভ সংস্কার অনুযায়ী সে ভাল-মন্দ শরীর গ্রহণ করে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পুনর্জন্মবাদ বিশ্লেষণ করিবার সময় বিজ্ঞান-সম্মত ক্রমবিকাশনীতির সাহায্য লইয়াছেন। ডারুইন, ওয়াইজম্যান, হাক্সলি প্রভৃতি মনীষীদের মতবাদের নজিরে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন: নিম্ন হইতে উচ্চ দিকে সমস্ত প্রাণীর গতি। সামান্য জীবাণু ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া জৈববিকাশের শ্রেষ্ঠ পরিণতি মনুষ্য-শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মনুষ্যজন্মের মধ্যেও ক্রমবিকাশের স্তর আছে, কেননা সকল মনুষ্য-শরীর কথনও এক রকম বা এক প্রকৃতির হয় না। অবশ্য এই প্রকৃতিভেদের জন্য সংস্কার দায়ী; সংস্কারের প্রবল প্রেরণাই মানুষের প্রকৃতিকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠন করে। সুতরাং বিকাশ সংস্কারেরই হয়। সংস্কারের বিকাশ বলিতে সৎ বা শুভ সংস্কারের দ্বারা অসৎ বা অশুভ সংস্কারের অভিভূতি। কোন সংস্কার কথনও নষ্ট হয় না। সংস্কার নষ্ট হওয়া বলিতে ধ্বংস নয়, পরন্তু অভিভূত বা নিস্তেজ হওয়া বুঝায়। আমাদের মনের বা অন্তঃকরণের অবচেতন স্তরে অসংখ্য জন্মের সহস্র সহস্র সংস্কার স্তূপীকৃত ও সুপ্ত থাকে। মাত্র যেগুলি ইচ্ছার প্রেরণায় জাগ্রত হয় তাহারাই ফল দিবার জন্য স্থূলমূর্তিতে মনের চেতন স্তরে প্রকাশ পায়, বাকী সমস্ত সংস্কার সুপ্ত অবস্থায় নিহিত থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: 'ব্রহ্ম মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধমনের গোচর'। এথানে শুদ্ধমন বলিতে বিশুদ্ধ বা সৎ সংস্কার বুঝিতে হইবে। সৎ সংস্কার মুক্তির কারণ। সৎ সংস্কার প্রবল হইলে অসৎ সংস্কার অভিভূত বা নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং সৎ সংস্কারের অনুপ্রেরণায় মুক্তিরূপ সংস্কারের উদয় হয় এবং সন্দেহবিনাশী আত্মজ্ঞান স্বতঃপ্রকাশিত হয়। সূক্ষ্মদেহী আত্মায় মানসিক বৃত্তি তথা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়,

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি অথবা চিত্ত ও অহংকারের প্রকাশ থাকে বলিয়া শুদ্ধবিজ্ঞান অভিভূত থাকে। বিবেক-বিচাররূপ সংস্কারের দ্বারা সূক্ষ্মদেহী যখন কারণ-শরীরের অভিমানে অভিমানী হয় তখনও অজ্ঞান অব্যক্ত আকারে থাকে; মনের তখন ক্রিয়া না হইলেও কারণাকারে অর্থাৎ অব্যক্তরূপে শুদ্ধচৈতন্যকে তাহা আবরণ করিয়া থাকে। এই অবস্থাকে শাস্ত্রে প্রকৃতি, অব্যক্ত, প্রজ্ঞা বা ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। আতিবাহিক আত্মা এই অব্যক্তাভিমানী হইলেও আত্মজ্ঞানের চেতনা লাভ করিতে পারে না। তবে সে যখন মায়ার অভিমান সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেয় তখনই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-রূপ প্রত্যভিজ্ঞা বা অনুভূতির প্রকাশ তাহাকে মুক্তির আশীর্বাদ দান করে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমূলক বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে পুনর্জন্মবাদের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য পাশ্চাত্য মতবাদের মধ্যে যেগুলি যুক্তি বা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ তাহাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। অবশ্য ক্রমবিকাশের নীতি ও বেদান্তের সত্যই তাঁহার সকল আলোচনার একমাত্র ভিত্তি। তিনি অভিব্যক্তি বা বিকাশের ক্রমোন্নত স্তরকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং সেই দিক দিয়া ভারতীয় শাস্ত্রের বাণী যেখানে সেই নীতি লঙ্ঘন করিয়াছে তাহাকেও তিনি অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক বলতে বিরত হন নাই। কর্মফল তিনি স্বীকার করিয়াছেন। সৎকর্মের ফল যে আত্মপ্রসারতা আনয়ন করে ও অসৎকর্মের ফল মানুষের মনে সংকীর্ণতার বন্ধন সৃষ্টি করে একথা অতীব সত্য। উপনিষদে অসৎকর্মের ফলে মানুষের অধোগতিরূপ নিম্ন শ্রেণীর জীব-জন্তুর শরীরেও আত্মার অনুপ্রবেশের কথা বলা হইয়াছে। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৬।২।১৬), ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৫।১০।৭), কঠ-উপনিষৎ (২।২।৭) ও কৌষিতকী উপনিষৎ (১।১-৬) প্রভৃতিতে মানুষের

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর শরীরে ফিরিয়া যাওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঐ সকল উল্লেখকে ঠিক উপনিষদ্‌কারের সত্যকার অভিপ্রায় বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন: ক্রমোন্নতিনীতির অনুযায়ী বিদেহী আত্মা একবার মনুষ্য-শরীর ধারণ করিলে কখনই আর অন্য কোন নিম্নশ্রেণীর পশু বা প্রাণী-শরীর গ্রহণ করে না; কারণ মনুষ্য-জন্মের মধ্যেই বিকাশের বিচিত্র স্তর দেখা যায়। মনুষ্যগণের ভিতরেই নগণ্য পশু-প্রবৃত্তির লোক যথেষ্ট পরিমাণে আছে। মন বা প্রবৃত্তির নজরে মানুষ পশুমানব ও দেবমানব রূপে নির্ধারিত হয়; সুতরাং নিম্নশ্রেণীর প্রবৃত্তি বরণ করিবার জন্য বিদেহী আত্মাকে আর পশু-শরীর ধারণ করিতে হয় না, মনুষ্য-শরীরে থাকিয়াই সে অনায়সে পশুর ন্যায় আচরণ করিতে পারে। পাইথাগোরাস, প্লেটো-প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকরাও উপনিষদের ন্যায় মানুষের আত্মা অসৎ কর্মবেশে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের শরীর ধারণ করে একথা বিশ্বাস করেন বলিয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাহাদের মতবাদ যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন।

পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিলে শুধু মনুষ্যের কেন—সমস্ত প্রাণীর আত্মাই পবিত্র ও অবিনশ্বর একথা প্রমাণ হয়। ক্রমবিকাশের স্তর অতিক্রম করিয়া মানুষ জাগতিক, মানসিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও ধর্মের ভূমিতে ক্রমশ আরোহণ করিয়া পরিশেষে আধ্যাত্মিক ভূমিতে নিজ স্বরূপের অনুভূতি লাভ করে ও কৃতকৃতার্থ হয়। পুনর্জন্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য মনের কৌতুহলের নিবৃত্তি বা চরিতার্থ নয়। বিদেহী আত্মাদের অস্তিত্ব আছে। প্রেতলোক মানসলোকের নামান্তর। মানুষ যেমন পৃথিবীলোকে সর্বপ্রকার বাসনার চরিতার্থের জন্য কর্ম ও আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, বিদেহী আত্মা বা প্রেতাত্মারাও তেমনি প্রেতলোক তথা মনোলোকে স্বপ্নের ন্যায় সমস্ত ভোগ সূক্ষ্ম আকারে চরিতার্থ করে এবং অপূরণীয় আকাংক্ষার বশে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কি প্রাচ্য ও কি পাশ্চাত্য উভয় দেশের

দেহাত্মবাদী নাস্তিকেরা পুনর্জন্ম স্বীকার করে না, মৃত্যুর পর আত্মা যে থাকে সে কথাও তাহারা বিশ্বাস করে না। তাহাদের মতে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, সুতরাং মানুষের প্রজ্ঞা বা চেতন আত্মা পার্থিব শরীরের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বেদান্তের দৃষ্টিভংগী লইয়া জড়বাদীদের মতবাদ খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, জড়বস্তু হইতে কখনও চেতন আত্মার সৃষ্টি হইতে পারে না, বরং জড়ের অধিষ্ঠান চৈতন্য আর চৈতন্য আছে বলিয়াই জড়ের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়। শরীরী বা আত্মার বিকার নাই, বিকার হয় শরীরের এবং শরীর অভিমান করে যে সেই দেহাভিমানীর। প্রকৃতপক্ষে শরীরের বিকারে আত্মার কোন বিকার হয় না। জন্ম-মৃত্যুরূপ পরিবর্তনের ভিতর শুদ্ধ আত্মচৈতন্য চিরদিন অবিকারী থাকেন। পুনর্জন্মবাদ আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্বের কাহিনী প্রকাশ করে। পার্থিব জীবনের পরিপূর্ণতার কথাই আমরা পুনর্জন্মবাদ হইতে জানিতে পারি। পরিপূর্ণ জীবন একমাত্র আত্মজ্ঞানের চেতনা হইতে লাভ হইতে পারে। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্যও তাই—আত্মচেতনা লাভ করা। আত্মচেতনার আশীর্বাদই মানুষকে পরিবর্তনময় পৃথিবীলোকেও যথার্থ শান্তি ও চিরসান্ত্বনা দান করে।

পুনর্জ্জন্মবাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুনর্জ্জন্ম

স্থূল বাস্তব জগৎ অনন্ত কার্য-কারণরূপ শৃঙ্খলে চিরদিন আবদ্ধ রহিয়াছে। কার্য বা ফলকেই আমরা দেখিতে পাই, কারণকে দেখিতে পাই না, কারণ সর্বদা দৃষ্টির বাহিরেই থাকিয়া যায়। কোন আপেল-বৃক্ষ হইতে যখন একটি আপেল ভূমিতে পতিত হয় তখন বুঝিতে হইবে—যে আপেলটি পড়িতেছে তাহা কোন এক অদৃশ্য শক্তির দৃশ্য ফল ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই অদৃশ্য শক্তিকে আমরা বলি 'মাধ্যাকর্ষণ' (gravitation)। যদিও কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কারণরূপী মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিকে দেখা যায় না তথাপি তাহার কার্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং অনুমান করা যায়, যে সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় শক্তিসমূহ নিয়ন্তারূপে অদৃশ্যে থাকিয়া কার্য করে এই দৃশ্যমান জগৎ বা সৃষ্টি তাহাদের স্থূল ও বিচিত্র বিকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। অদৃশ্য শক্তিসকল ও জড়বস্তুর অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম উপাদানগুলি একসঙ্গে মিলিত হইয়া স্থূল বিশ্ববৈচিত্র্যের সূক্ষ্মরূপকে সৃষ্টি করিয়া থাকে।

এই সূক্ষ্মরূপেরও কারণ ইন্দ্রিয়াতীত শক্তিগুলিকে আমরা স্থূল বা জড়ের কারণ-উপাদান অথবা নিমিত্তকারণ বলি। সূক্ষ্ম-শক্তির বহির্বিকাশই স্থূলবস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং যাহাদের আমরা স্থূল পার্থিব বস্তু বা পদার্থ বলি তাহারা অদৃশ্য সূক্ষ্মশক্তির বিকাশ মাত্র আর এজন্য সূক্ষ্মশক্তি-সকল স্থূল ও জড় পদার্থের উপাদানগুলির উপর সর্বদা ক্রিয়া করিয়া থাকে। উদাহরণ যেমন, সূক্ষ্ম মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প দুইটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে মিলিত হইলে জলরূপে পরিণত হয়। জল হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প দুইটিকে কখনো আলাদা করা যায় না, উহারা জলেরই সূক্ষ্ম মৌলিক উপাদান। সুতরাং জলের অস্তিত্ব তাহার মূল উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প দুইটীর উপর নির্ভর করে, অথবা বলা যায় ঐ বাষ্প দুইটিকে লইয়াই জলের সার্থকতা। সেজন্য জলের উপাদান বাষ্প দুইটীর যখন কোন বিকার বা পরিবর্তন হয় তখন তাহাদের স্থূল বিকাশ-রূপ জলেরও বিকার বা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এরূপে দেখান যায় যে, একটি চারাগাছের সকল-কিছু বৈশিষ্ট্য তাহার সূক্ষ্মকারণ-রূপ বীজের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। সেরূপ যে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মশক্তি দৃশ্যমান প্রাণীজগতের অণু-পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির চরমবিকাশ মনুষ্য-জগৎ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের স্তরগুলির ভিতর অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহার বৈশিষ্ট্যের উপর ক্রমিক স্তরগুলির বৈশিষ্ট্যও একান্তভাবে নির্ভর করে।

মানুষের স্থূলশরীরের সঙ্গে তাহার সূক্ষ্মশরীরের অতিশয়

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শুধু তাহাই নয়, স্থূলশরীরের প্রত্যেকটি বিকাশ এবং পরিবর্তনও তাহার সূক্ষ্মশরীরের বিকাশ ও পরিবর্তনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিকাশ বা পরিবর্তনকে কার্য বলে। কেননা দেখা যায়, সূক্ষ্মশরীরে যদি সামান্যভাবেও কোন বিকার বা পরিবর্তন উপস্থিত হয় তবে স্থূলশরীরও তাহার জন্য বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতপক্ষে স্থূল সূক্ষ্মেরই কার্যাবস্থা আর সেজন্য স্থূলশরীরের জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি ও সমস্ত বিকারই সূক্ষ্মশরীরের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যতদিন কারণরূপী সূক্ষ্মশরীর থাকে ততদিন স্থূলশরীরে তাহার প্রভাব বা ক্রিয়া কার্যরূপে চলিতে থাকে।

এখন পরিষ্কার করিয়া বুঝা উচিত—সূক্ষ্মশরীর কাহাকে বলে। সূক্ষ্মশরীর আসলে চেতন কোন একটি পদার্থের সূক্ষ্ম বিকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই সূক্ষ্মবিকাশ বা পদার্থের নাম 'প্রাণশক্তি'। প্রাণশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া জড়-পদার্থের পরমাণু তুল্য অতি ক্ষুদ্র উপাদানগুলি সূক্ষ্মশরীরে একত্রিত হয়। বৃক্ষের বীজে যেমন বৃক্ষের প্রাণ ও বৃদ্ধিশক্তি নিহিত থাকে, মানুষের সূক্ষ্মশরীরে তেমনি তাহার মন ও চিন্তাশক্তি প্রাণ-শক্তির সহিত একীভূত হইয়া অবস্থান করে। সাংখ্য ও বেদান্তের মতে সপ্তদশ অবয়ব-সমষ্টির নাম 'সূক্ষ্মশরীর'। সপ্তদশ অবয়ব যেমন, অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তিসকল মন বুদ্ধি[১]

১। অন্তঃকরণের চারিপ্রকার বৃত্তি—মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার। বেদান্তাচার্যদের অনেকে মন ও বুদ্ধি এই দুটিমাত্র বৃত্তি স্বীকার করিয়া চিত্তকে মনের ও অহংকারকে বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

চিত্ত ও অহংকার; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়: চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ ও জিহ্বার শক্তি; পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়: বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এবং পঞ্চপ্রাণ: প্রাণ অপান ব্যাণ সমান ও উদান। 'প্রাণ' সংস্কৃত শব্দ। প্রাণ অর্থে জীবনীশক্তি; অর্থাৎ যে শক্তিকে অবলম্বন করিয়া জীব জন্তু বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতি প্রাণবান পদার্থ বলিয়া পরিচিত অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকে তাহাকেই 'জীবনীশক্তি' বলে। যদিও প্রাণ একটি তথাপি ভিন্ন ভিন্ন কার্য ও গুণ অনুসারে তাহা পাঁচটি রূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং 'প্রাণ' বলিতে এক জীবনীশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি অভিব্যক্তি বা বিকাশকে বুঝিতে হইবে। এই পঞ্চপ্রাণের ভিতর যে শক্তি আমাদের শ্বাসযন্ত্রকে (lungs) পরিচালিত করে ও বাহির হইতে শরীরের ভিতর বাতাস টানিয়া লয় তাহাকে 'প্রাণ' বলে। যে শক্তি শরীরের ভিতর হইতে বাতাস বাহির করিয়া দেয় তাহাকে 'অপান' বলে। ঐ শক্তি আবার যখন আমাদের পরিপাক-কার্য (digestion) সম্পাদন করে ও ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের সারভাগ শরীরের প্রত্যেকটি অংশে পরিচালিত করিয়া লইয়া যায় তখন তাহাকে 'সমান' বলে। ঐ প্রাণশক্তি যখন মুখ হইতে খাদ্যকে গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্টিকরণী নাড়ির ভিতর দিয়া তাহাকে উদরের মধ্যে লইয়া যায় ও কথা কহিতে সাহায্য করে তখন তাহাকে 'উদান' বলে, আর যে প্রাণশক্তি আপাদমস্তক সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া থাকে, সমস্ত শিরা ও স্নায়ুমণ্ডলে প্রবাহিত হয়, শরীরের বিস্তৃতি ও দেহের আকারকে বজায়

রাখে, দেহের কোন অংশ যাহাতে পচিয়া না যায় তাহা হইতে সর্বদা রক্ষা করে এবং প্রত্যেকটি গ্রন্থিকোশ (cell) ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সতেজ ও সজীব রাখে তাহাকে 'ব্যান' বলে। এই পঞ্চবায়ু এক জীবনীশক্তি বা প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। সূক্ষ্মশক্তিরূপ পঞ্চপ্রাণ, স্থূলশরীরের অবিমিশ্র উপাদান সমূহ অথবা সূক্ষ্ম পদার্থসমূহের বায়বীয় উপাদানগুলি এবং প্রত্যেক লোক ও প্রাণী তাহাদের একটি জীবনে যে সমস্ত সংস্কার, ধারণা ও বাসনার সৃষ্টি করে তাহাদের সুপ্ত অথবা অব্যক্ত অবস্থাগুলি একত্রিত হইয়া সূক্ষ্মদেহ (subtle body) সৃষ্টি করে। কোন সংস্কার কখনও নষ্ট হয় না। পূর্ব-পূর্ব জীবনের সমস্ত সংস্কারই সূক্ষ্ম বীজের আকারে আমাদের অন্তঃকরণে সঞ্চিত থাকে। এই অন্তঃকরণের আর এক নাম প্রকৃতি বা অব্যক্ত। সমস্ত প্রাণীর বর্তমান জীবনের শারীরিক ও মানসিক যে কোন প্রকার কর্মের সংস্কার কখনও বিনষ্ট হয় না। বর্তমান জীবনের সংস্কারই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রবৃত্তি ও বাসনারাশিরূপে সর্বদা বিকাশ লাভ করে। অতীত জীবনের সংস্কাররাশি যেমন বর্তমান জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, বর্তমান জীবনের সংস্কারগুলিও তেমনি আমাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনকে পরিচালনা করিয়া থাকে।

শরীর ও মনের সাহায্যে আমরা যে কোন চিন্তা বা কার্য করি না কেন, তাহাদের যাবতীয় সংস্কার সূক্ষ্ম আকারে আমাদের মনের অবচেতন স্তরে (subconscious mind)[২] সঞ্চিত থাকে।

২। স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার *Our Relation to the Absolute* (1946)

তবে সংস্কারসমূহ মনের এই অজ্ঞাত অবচেতন স্তরে সুপ্ত ও লুক্কায়িত থাকিলেও অবসর পাইলে আবার তরঙ্গের ন্যায় মনঃ-সমুদ্রের উপরিভাগে উত্থিত হয় এবং নূতন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিসমূহের সৃষ্টি করে। বেদান্তে এই ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিগুলিকে 'বাসনা' নাম দেওয়া হইয়াছে। বাসনা বা প্রবল ইচ্ছাসমূহ প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য কেন—সমগ্র প্রাণীজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। প্রবৃত্তিই আসলে প্রাণীদের নূতন শরীর উৎপাদনে বা গ্রহণে সাহায্য করে। 'প্রবৃত্তিরেষ ভূতানাম্'—প্রাণীগণের প্রবৃত্তিই সংসারের মূল। তাই কাহারও মনে যদি পার্থিব সুখ ও বিষয়-ভোগের বাসনা অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, এমন কি শত শত জন্মের বা শরীর ধারণের পরও যদি অতৃপ্ত বাসনার পরিপূরণ না হয়, তবে ভোগ করিবার জন্য তাহাকে আবার শরীর ধারণ করিতে হইবে। প্রবল ইচ্ছার উদ্দাম প্রবাহকে কেহ বা কোন-কিছু শক্তি কখনও প্রতিরোধ করিতে পারে না; শীঘ্র হোক আর বিলম্বে হোক, কারণরূপ সেই বাসনা কার্যরূপে তাহার ফল প্রসব করিবেই।

শরীর মন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটি কর্ম ও চেষ্টা ইচ্ছা অথবা

পুস্তকে মনের অচেতন স্তরকে 'বিশাল সমুদ্রতুল্য' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ এবং পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিৎ ডাঃ ফ্রয়েড, ডাঃ ইয়ুঙ, ডাঃ এডলার, এ্যালান প্রভৃতিও অবচেতন মনকে বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। পূর্বপূর্ব ও বর্তমান জীবনের অগণিত সংস্কার বীজাকারে সুপ্ত থাকিয়া এই অজ্ঞাত অবচেতন মনের রূপকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

অনিচ্ছাকৃত হইলেও সূক্ষ্ম শরীররূপী অবচেতন মনে সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত সংস্কারের প্রেরণা অনুযায়ী নিয়ত গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ও পরিবর্তন যদিও কারণাকার উদ্বুদ্ধ ও ক্রিয়মান সংস্কারগুলির প্রেরণা ও প্রয়োজন অনুযায়ীই সাধিত হয় তথাপি সমস্ত কার্য, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম, বিচিত্র কর্মসাধনে শারীরিক বৃত্তি ও চেষ্টা এবং কর্ম-সাধনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় প্রণালীগুলিও সূক্ষ্মশরীরে সঞ্চিত সুপ্ত সংস্কাররাশির বহির্বিকাশ মাত্র। ঐগুলির উপরই পশু ও মানব-শরীরের নির্বাচন নির্ভর করে; অর্থাৎ কোন্ সংস্কার পশু-শরীর ধারণ করিবে অথবা কোন্ সংস্কার মানব-শরীর ধারণ করিবে সে নির্বাচন তাহাদের প্রত্যেকের পশু বা মানব-প্রবৃত্তির সংস্কারের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ইহা সত্য যে, কামনা বা প্রবৃত্তির ভিতর যেগুলি প্রবল ও বিকাশোন্মুখ তাহাদের অনুযায়ীই ইন্দ্রিয়-সকলেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে। কাজেই ইন্দ্রিয়-রূপ যন্ত্রগুলি একদিক দিয়া সুপ্ত ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির স্থূলবিকাশ। যেমন, ক্ষুধা অর্থাৎ খাইবার ইচ্ছা না থাকিলে আমাদের দাঁত, গলা ও পেটের উপযোগীতা কিছু থাকিত না; অথবা কোন-কিছু গ্রহণের ও চলিবার ইচ্ছা সূক্ষ্ম আকারে না থাকিলে আমাদের হাত ও পায়ের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিত না। এইরূপ দেখা, শোনা প্রভৃতির সূক্ষ্ম ইচ্ছাই আমাদের স্থূল চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। হাতকে কাজে লাগাইবার ইচ্ছা যদি আমাদের না থাকে, অর্থাৎ হাতের ব্যবহার যদি আমরা একেবারেই না করি তবে

কয়েক মাসের মধ্যে হাত আমাদের শুষ্ক ও অকেজো হইয়া যাইবে এবং পরিশেষে মরিয়া যাইবে। ভারতবর্ষে অনেক ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি আছেন যাঁহারা সর্বদা উর্ধ্ববাহু হইয়া থাকেন, হাতের ব্যবহার একেবারেই করেন না। তাই দেখা যায়, ঐ সকল লোকের হাত কয়েক [illegible]সের মধ্যে শুকা[illegible] শক্ত ও মৃত হইয়া যায়। সেরূপ কোন [illegible] মাস তাহার পৃষ্ঠের উপর ভর দিয়া শুইয়া [illegible] চালবার শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। রূপ[illegible]টে অভাব নাই। সুতরাং ইহা হইতে প্রমা[illegible] ই[illegible]প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়-সমূহকে ব্যবহার না করিলে তাহার[illegible]চয়ই অকেজো হইয়া অনিষ্টকর ফল উৎপন্ন করে। সাধারণতঃ মানু[illegible]কার-প্রকার যেমন তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী হয়, তেমনি প্রত্যেক প্রাণীর শারীরিক গঠনও তাহার চরিত্র বাসনা ইচ্ছা ও চিন্তা অনুসারে হইয়া থাকে। সুতরাং একথা ঠিক যে, প্রত্যেক প্রাণীর বাহ্য-প্রকৃতি আন্তর প্রকৃতির [illegible] বহির্বিকাশ। আন্তর প্রকৃতির নাম 'স্বভাব', ইংরাজীতে ইহা[illegible]মরা 'নেচার' বলি। এই প্রকৃতি বা স্বভাবের পুনঃপুনঃ আত্মপ্রকাশের নাম 'পুনর্জন্ম'। কোন মানুষ মরিয়া গেলে তাহার জীবাত্মার (সংস্কৃতে 'জীব') কিন্তু কখনও মৃত্যু হয় না। জীবাত্মা সূক্ষ্ম আকারে অদৃশ্যভাবে অনন্তকাল ধরিয়া বাঁচিয়া [illegible]কে [illegible] কার্য-কারণসূত্রে ভিন্ন ভিন্ন জীবনের সংস্কাররূপী [illegible]গুলিকে একত্রে গ্রথিত করিয়া নিত্য একটি যোগসূত্রের ন্যায় সে বর্তমান থাকে।

সূক্ষ্মশরীরকে একটি জলবিন্দুর সহিত তুলনা করা যায়

আর এই জলবিন্দু সীমাহীন অতীতের বক্ষে চির-অপরিবর্তনশীল শাশ্বত ব্রহ্ম-সমুদ্রের গর্ভ হইতে যেন উত্থিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম-শরীররূপী জীব নিত্য ও কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্যোতির একটি প্রতিবিম্ব মাত্র। জলবিন্দু যেমন অদৃশ্য বাষ্পের আকারে মেঘ-জালে কিছুক্ষ[illegible] করিয়া তবে বৃষ্টি, হিমশিলা অথবা ব[illegible]রায় কুয়াসা বা ধোঁয়ার আকারে [illegible] তাহার কখনই হয় না, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির [illegible] সূক্ষ্মশরীরী জীবাত্মাও তেমনি কখনও অব্যক্ত [illegible]কে আবার কখনও ব্যক্ত হইয়া পশু অথবা মানব-শরীরের [illegible]র স্থূলভাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে। মা[illegible]ত্মা মৃত্যুর পর যেকোন গ্রহ-উপগ্রহে গমন করিতে পারে, অথবা এই পৃথিবীলোকেই সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে পারে।[৩] তবে এই জন্মগ্রহণ করা বা না-করা জীবাত্মার প্রকৃতি এবং তাহার সমগ্র জীবনের প্রবৃত্তি ও মনের ইচ্ছাশক্তির

৩। ছান্দোগ্য উপনি[illegible] (৫।১০।৪—৬) এই সমস্ত লোক ও অবস্থার কথা বলা আছে। যেমন "মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাদাকাশম্, আকাশাচ্চন্দ্রমসম্, এষ সোমো রাজা, তদ্দেবানামন্নং ; তং দিবা ভক্ষয়ন্তি।* * পুনর্নিবর্তন্তে যথেতম্ আকা[illegible]কাশাদ্বায়ুম্, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবতি" ইত[illegible]ড়া বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৬।২।১৫-১৬ ; ঋগ্বেদ ১০।১৯।১, কৌষী[illegible]ষৎ ১।৪, প্রশ্ন উপনিষৎ ১।৯ প্রভৃতিতেও ইহার উল্লেখ আছে। স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত *Life Beyond Death* ('মৃত্যুর পরপারে') পুস্তক পৃঃ ৪৮-৫৮ দ্রঃ।

উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বেদান্তে এই বিষয়টী আরও বিশদ ও পরিষ্কারভাবে বুঝানো হইয়াছে। গীতায়ও বলা হইয়াছে,

যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥[৪]

মৃত্যুকালে যে চিন্তা, ইচ্ছা অথবা বাসনা প্রবল থাকে, মৃত্যুর পর তাহা আরও অধিক হয় এবং মৃত আত্মা বা প্রেতাত্মার আন্তর প্রকৃতি ও চরিত্রকে তাহা সেভাবে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাহা ছাড়া নূতনভাবে গঠিত অথবা পরিবর্তিত আন্তর প্রকৃতি বা স্বভাবই প্রাণীর নূতন শরীর ধারণ করিতে সাহায্য করে। এই আন্তর প্রকৃতিকে আবার যে সকল চিন্তা, আসক্তি অথবা ইচ্ছা গঠন করে তাহাদের মধ্যেও পুনর্জন্ম-গ্রহণের অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশকে নির্বাচন এবং গ্রহণ করিবার শক্তি নিহিত থাকে। তবে এ নির্বাচন ও গ্রহণ-প্রণালী সম্পূর্ণভাবে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (natural selection) রূপ নিয়ম ও নীতিকে বেশীর ভাগ অনুসরণ করে।

৪। গীতা ৮।৬

ইহা ছাড়া গীতার ৮।৫ শ্লোকেও 'অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্। যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি' ** প্রভৃতি কথার দ্বারা মানুষের নিজের নিজের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছাই যে আসলে ভাগ্যনিয়ন্তা, ইচ্ছা করিলে যে নিজেকে সে বদ্ধ বা মুক্ত করতে পারে, একথা শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আত্মজ্ঞান লাভ করিলে ('মামুপেত্য') মানুষের আর পুনর্জন্ম লাভ হয় না ('পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'—গীতা ৮।১৬) একথাও শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করিয়াছেন।

এক্ষণে এই নির্বাচন ও গ্রহণপ্রণালীকে ভালভাবে বুঝিতে হইলে আমাদের অনুশীলন করিয়া দেখিতে হইবে যে, কেমন করিয়া বিভিন্ন বৃক্ষের বীজগুলি সাধারণ পরিবেশ বা পরিবেষ্টনীর ভিতর হইতে আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে উপাদানসমূহকে গ্রহণ করে এবং প্রকৃতির ভিতর হইতে সেগুলিকে নির্বাচন করিয়া নিজেদের মধ্যে আহরণ, শোষণ ও পরিপাক করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, একটি ওক্ ও অপরটি চেষ্ট্‌নাট বা বাদাম গাছের বীজ রোপণ করা হইল। একথা ঠিক যে, দুইটি বীজের মধ্যে বাড়িবার শক্তি সমানভাবে নিহিত থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মৃত্তিকা, জল, উত্তাপ এবং আলোকও সমানভাবে তাহারা পাইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দুইটি বীজের মধ্যে দুইটি বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে, থাকে আর এই দুইটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য এক পরিবেশ বা আবেষ্টনীর ভিতর থাকিলেও তাহারা আপন আপন প্রকৃতিকে পৃথক-ভাবে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। এরূপে বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীও তাহারা আহরণ করে যাহাতে তাহাদের প্রত্যেকের ফল ফুল পাতা প্রভৃতিও পৃথক আকারে ও রূপে সৃষ্ট হয়। তাহা ছাড়া মনে করুনঃ ঐ দুইটি বীজের মধ্যে চেষ্ট্‌নাট বা বাদামের বীজটি হর্স-চেষ্ট্‌নাট জাতীয়। এক্ষণে বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া হর্স-চেষ্টনাটের বীজটি যদি নিজের প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মিষ্ট চেষ্টনাটে রূপান্তরিত হয় তবে একথা সত্য যে, ঐ রূপান্তরের সঙ্গে হর্স-চেষ্ট্‌নাট বৃক্ষের সমগ্র প্রকৃতি, তাহার পাতা এবং ফল প্রভৃতিরও

পরিবর্তন হইবে। হর্স-চেষ্ট্‌নাটের বৃক্ষটি বীজ থাকিবার সময়ে যে পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া ও যেরূপ খাদ্যসামগ্রী ও উপাদান আকর্ষণ, আহরণ এবং পরিপাক করিত, মিষ্ট-চেষ্ট্‌নাটের বীজটি বৃক্ষে রূপান্তরিত হইবার পর অবশ্য সেরূপ খাদ্যসামগ্রী ও উপাদান আর গ্রহণ করিবে না, বরং প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মানুসারে ধীরে ধীরে সকল-কিছুরই পরিবর্তন হইবে। মানুষ অথবা প্রাণীদের আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা। প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) অনুযায়ী মৃত মানুষের নূতন নির্মিত মনোশরীর বা সূক্ষ্মদেহ সেরূপ সাধারণ আবেষ্টনীর ভিতর হইতে তাহার যথাযথ বিকাশ বা জন্মের উপযোগী ক্ষেত্র বা স্থানকে বাছিয়া লইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

যে সব জীবাত্মা মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে তাহাদের জন্মের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেন পিতা-মাতারাই। পিতামাতারাই প্রকৃতপক্ষে সন্তানদের পরিবেশ সৃষ্টি করিবার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকার অংশ গ্রহণ করেন, ইহা ছাড়া তাঁহাদের আর কোন উপযোগীতা নাই। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী নূতন সুক্ষ্মশরীর-ধারণে জীবাত্মাদের ইচ্ছাযুক্ত প্রকৃতি বা মনোবৃত্তি জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে তাহাদের ক্ষেত্রের উপযোগী পিতামাতাগণকে নির্বাচন করে এবং সেই পিতামাতাদিগকে অবলম্বন করিয়াই তাহারা পৃথিবীতে আবার জন্মগ্রহণ করে। উদাহরণ যেমন, যদি আমার প্রসিদ্ধ একজন শিল্পী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার প্রবল বাসনা হৃদয়ে থাকে এবং জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র জীবন চেষ্টা সত্বেও সেরূপ

প্রসিদ্ধ একজন শিল্পী হইতে না পারি তবে সেই অপূর্ণ বাসনার জন্য মৃত্যুর পর পুনরায় এমনই পিতামাতারূপ ক্ষেত্র ও পরিবেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে—যে ক্ষেত্র ও পরিবেশ আমাকে পুনর্জন্ম গ্রহণের পর একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীতে পরিণত করিবার জন্য সাহায্য করিবে।

ভারতীয় দর্শনে এই সমগ্র জন্মগ্রহণের নিয়ম-নীতিকে পুনর্জন্মবাদ বলে। যদিও পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের অনেকে এই পুনর্জন্মবাদকে ঠিক ঠিক স্বীকার করিতে চান না তথাপি বর্তমানে বেশীর ভাগ লোক আবার নিঃসন্দিগ্ধভাবে এই মতবাদকে গ্রহণ করিতেছেন এবং অতীতের যুগেও অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতবাদের বৈজ্ঞানিক ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও আবার হিন্দুদের শাস্ত্রেই একমাত্র দেখা যায়—অন্য কোথায়ও বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে একথা সত্য যে, বিভিন্ন দেশের দার্শনিক মনীষী ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা সুপ্রাচীন কাল হইতে এই মতবাদকে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন ইজিপ্টের সভ্যতা এই পুনর্জন্মবাদের উপরই গড়িয়া উঠিয়াছিল যদিও তাহা অপরিণত ও স্থূলভাবাপন্ন ছিল। মনীষী হেরোদোতাস বলিয়াছেন: 'ইজিপ্টবাসীরা প্রমাণ করিয়াছেন—মানুষের আত্মা অবিনাশী ও শাশ্বত। যেখানে কোন একটি মানুষ মরিয়া গিয়াছে সেখানে তাহার আত্মা অপর একটি প্রাণীর শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে আর ঐ প্রাণীর শরীর মৃত মানুষের আত্মাকে গ্রহণ করিবার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়াই থাকে।' মনীষী পাইথাগোরাস্ এবং তাঁহার শিষ্যগণও

গ্রীস ও ইতালীতে এই মতবাদ বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। পাইথাগোরাস্ বলিয়াছেন: 'সকলেরই আত্মা আছে। সকল আত্মাই বিরাট ইচ্ছা বা নিয়মের নিয়ন্ত্রাধীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।' কবি ড্রাইডেনের "ওভিড্" কবিতায়ও আমরা দেখি—উল্লেখ আছে:

> 'মৃত্যু কভু পারে নাকো নাশিবারে অমর আত্মায়
> এ শরীর মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যবে যায়,
> নূতন আবাস খোঁজে আত্মা পুনঃ নব দেহ ধরে,
> নবপ্রাণ-আলোকেতে সেই দেহ উদ্দীপিত করে।'

প্লেতোও বলেছেন: 'জীবাত্মা শরীর অপেক্ষা প্রাচীন। জীবাত্মারা ক্রমাগতই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।' গ্রীস ও ইতালীতে পাইথাগোরাস্, এম্পিডোক্লিস্, প্লেতো, ভারজিল্ ও ওভিড্ প্রভৃতি মনীষীগণ পুনর্জন্মবাদের ধারণা অধিক পরিমাণে প্রচার করিয়াছিলেন। প্লতিনাস, নিও-প্লতিনাসবাদীগণ ও প্রোক্লাস পুনর্জন্মবাদ-নীতি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। প্লতিনাস্ বলিয়াছেন: 'আত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলে তাহার শক্তি আরও বর্ধিত ও বিকশিত হয়। সুতরাং এই পৃথিবী হইতে আমাদের লোকান্তরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। মনোলোকে অথবা বোধির রাজ্যে চলিয়া যাওয়াই আমাদের উচিত, কারণ সেখানে গেলে ঐন্দ্রিয়িক ছায়ারূপ আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া আর মর্ত্য জীবন যাপন করিতে হইবে না * *।' পারস্য-দেশীয় মেজাই বা যাজকমণ্ডলী-প্রবর্তিত ধর্মেরও মূলসূত্র তাই। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার-দি-গ্রেটও হিন্দু দার্শনিকদের

সংস্পর্শে আসিয়া এই মতবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন। জুলিয়াস্ সিজারও বুঝিয়াছিলেন: মানুষ মরিয়া গেলে তাহার আত্মা যে আবার জন্মগ্রহণ করে একথা গল্‌বাসীরাও বিশ্বাস করিতেন। প্রাচীন গল্‌দেশের ড্রুহিদের ভিতরও এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, মানুষের আত্মা সমান প্রকৃতি ও চরিত্রবিশিষ্ট শরীরের মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করে। কেল্‌ট্‌বাসী অথবা ব্রিটন্‌রাও এই মতবাদে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আরবীয় দার্শনিক ও বহু মুসলমান সুফীসম্প্রদায়ভুক্ত মরমীদের কাছেও এই মতবাদ অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বেবিলোন-ক্যাপ্‌টিভিটির৫ পরে ইহুদীরাও এই পুনর্জন্মবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'মানুষের মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে পারে' এই প্লেতো-প্রদর্শিত মতবাদ যীশুখৃষ্টের সমসাময়িক আলেকজান্দ্রিয়ার ফাইলো জুডিয়াও হিব্রুদের ভিতর প্রচার করিয়াছিলেন। ফাইলোও স্বীকার করিয়াছেন: 'মৃত বিদেহী জীবাত্মাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে এইরূপ নিয়ম আছে যে, তাহারা মর্ত্যশরীরে প্রবেশ করিবে এবং নির্দিষ্ট কয়েকদিন পরে আবার সেই দেহ ছাড়িয়া মুক্ত দিয়া হইয়া চলিয়া যাইবে।' ইহুদীদের মতে জন্‌-দি-ব্যাপটিষ্ট

৫ ইহুদীদের এই বেবিলোন ক্যাপ্‌টিভিটি ৫৮৬-৫৮৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে জেরুজালেম-অভিযানের সময় নেবুকাঠার (Nebuchadnezzar) কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল এবং যতদিন পর্যন্ত না সাইরাস কর্তৃক বেবিলোন আক্রান্ত হইয়াছিল ততদিন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তাহা তাঁহার শাসনাধীনে ছিল।

দ্বিতীয় এলিজা ছিলেন। যীশুখৃষ্ট যে মহাপুরুষরূপে আরও শরীর ধারণ করিয়াছেন একথাও তাহারা বিশ্বাস করিত।[৬] সোলোমান তাঁহার 'বুক অফ উইস্‌ডম্‌'-এ বলিয়াছেন: 'আমি শান্ত-শিষ্ট একটি বালক ছিলাম। একটি পবিত্র আত্মার সহিত পরে আমার মিলন হয়। তথবা যেজন্য আমি অত্যন্ত সৎপ্রকৃতি-সম্পন্ন ছিলাম সেজন্য নির্মল ও পবিত্র একটি শরীরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি।'

তাল্‌মুদ ও ক্যাবালা[৭] হইতেও আমরা ঠিক এই একই রকমের মতবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা পাই। তাল্‌মুদে বলা হইয়াছে: এবেলের আত্মা প্রথমে সেথের শরীরে প্রবেশ করিল, তাহারপর মোজেসের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। কাবালার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লোকান্তর ও পুনর্জন্মতত্ত্ব ইহুদীয় ধর্মে প্রবেশলাভ করে। তাহার পর এমন কি ভাবযোগের (Mysticism) প্রতি যাঁহারা সামান্যও আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহারাও এই তত্ত্বে ক্রমশঃ বিশ্বাসবান হইতে লাগিলেন। উদাহরণ যেমন, জুদা-বেন্‌-আসের (Juda ben Asher) বা আসেরি (Asheri) একটি পত্রে তাঁহার পিতার সহিত পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে

৬। বাইবেলে ম্যাথু, XVI. ১৪ এবং XVII. ১২ দ্রষ্টব্য।

৭। ইহুদিদিগের মধ্যে এক সময়ে প্রচলিত ভাবযোগ (Mysticism), আত্মবিদ্যা ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের প্রচার ছিল। এই বিদ্যা ও ক্রিয়া-মূলক ধর্মকেই 'কাবালা' বলে।

আলোচনা করিয়াছিলেন যেন ঐ তত্ত্বটি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধারণের ভিতর প্রচারিত হয়।[৮]

আমরা পুনরায় দেখি : 'মরমী চিন্তার অবদানরূপেও এই পুনর্জন্মবাদের তত্ত্ব ও আলোচনা বহুলপরিমাণে রহিয়াছে বলিয়া কাবালাধর্মিগণ আগ্রহের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া এই জন্মান্তরবাদ তাঁহাদের মনোবিজ্ঞানের একটি অনুমান বা উপসিদ্ধান্তবিশেষ ছিল। তাঁহারা একথাও বিশ্বাস করিতেন যে, জীবাত্মা বা সূক্ষ্মশরীরের শেষ পরিণতি হইবে অনন্তকাল হইতে যে বীজ ইহার মধ্যে নিহিত আছে তাহা সমগ্র পরিপূর্ণ বিকাশের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইবে ও পরিশেষে যে অনন্তের উৎস হইতে তাহা প্রথমে আসিয়াছিল সেখানেই আবার সে ফিরিয়া যাইবে। তবে যে সমস্ত বাসনা ইহজগতে ঘটনাক্রমে পরিপূরণ হয় নাই অথবা মূল কারণের সহিত পুনর্মিলিত হইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে যাহারা পবিত্র হইতে পারে নাই, সে সবের জন্য আবার একটি জন্মগ্রহণ করিবার সুযোগ-সুবিধা তাহাদের অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং প্রথম মানব-শরীর লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার পর জীবাত্মা যদি বুঝিতে না পারে কেন সে স্বর্গ হইতে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে এবং তাহার জন্য আবার যদি সে মানসিক গ্লানি ও আবিলতার মধ্যে পতিত হয়, তবে যতদিন না বারম্বার পরীক্ষার ভিতর দিয়া সে পুনরায় অভিজ্ঞতা

জুইস্ এন্‌সাইক্লোপেডিয়া, ১২শ ভাগ, পৃঃ ২৩২

সঞ্চয় করিয়া যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিতেছে ততদিন ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণের জন্য তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে।

জোহারও (Jobar) এই পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস করে। জোহারে উল্লিখিত আছে: সমস্ত মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় শরীর ধারণ করিতে হইবে। যদিও মানুষের আত্মা স্বভাবত পবিত্র ও অমৃতস্বরূপ তথাপি ভগবানকে লাভ করিবার উপায় বা পথ গোড়াকার দিকে সে মোটেই জানে না। পরলোকগত আত্মারা ইহাও জানে না যে, এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে এবং পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পরে তাহাদের সকলকে বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে কি-না। শুধু তাহাই নহে, ইহাও তাহারা জানে না যে, আরও অসংখ্য জন্মের ঘটনাপ্রবাহ ও রহস্যময়ী পরীক্ষা তাহাদের অতিক্রম করিতে হইবে কি-না। কতগুলি জীবাত্মা এই পার্থিব জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে আর কতগুলিই বা স্বর্গাধিপতির রাজপ্রাসাদে এখনও ফিরিয়া যায় নাই এ তথ্যও তাহারা জানে না। তাহা ছাড়া মানুষ প্রকৃতই জানে না যে, দড়ির সাহায্যে প্রস্তর নিক্ষেপের ন্যায় জীবাত্মারা কেনই বা জন্ম-মৃত্যুরূপ চক্রে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে। তবে এ কথাও অতি সত্য যে এই অজ্ঞাত রহস্য আবিষ্কৃত হইবার দিন মোটেই আর বিলম্ব নাই।[১]

খৃষ্টান যাজকমণ্ডলীর ন্যায় অধিকাংশ ক্যাবালধর্মী পুনর্জন্ম-

১। জোহার, ২য় অঃ পৃঃ ৯৬ বি দ্রষ্টব্য।

বাদকে 'ঈশ্বরের ন্যায়বিচার' এই যুক্তির বশবর্তি হইয়া স্বীকার করিত। এই পুনর্জন্মবাদে তাহাদের বিশ্বাস থাকার জন্য এ প্রশ্নও তাহাদের মনে জাগ্রত হইত: কেন ঈশ্বর অত্যন্ত দুশ্চরিত্র লোককে সুখে জীবনযাপন করাইয়া থাকেন অথচ সত্যকার যাঁহারা সৎ ও সাধুলোক তাঁহাদের তিনি অজস্র দুঃখ-কষ্টের ভিতরে দিনাতিপাত করান। তবে এ রহস্য অতীব দুর্জ্ঞেয়, ইহার মীমাংসা করাও অত্যন্ত কঠিন। তাহা ছাড়া পর ইহাও ঠিক কথা যে, যদি সরল শিশুদের আত্মা পূর্বজন্মে কোনপ্রকার অন্যায় ও পাপকার্য করিয়া থাকে তবে শাস্তিবিধানের জন্য তাহাদের স্কন্ধে দুঃখকষ্টের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া ঈশ্বরের পক্ষে যুক্তিযুক্ত, অন্যথা তাহাদিগকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দিলে ঈশ্বর বরং নির্মম কার্যই করিবেন। আইজ্যাক এব্রাভানেল (Isaac Abravanel) লেভিরেটের (Levirate) আদেশে পুনর্জন্মবাদের প্রমাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত তিনটি যুক্তি তাহার পক্ষে দেখাইয়াছেন; যেমন (১) রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট শরীরে উত্তেজিত হইয়া যাহারা নরহত্যা ও ব্যভিচার প্রভৃতি ভীষণ অপরাধের কার্য করিয়াছে ঈশ্বর করুণা করিয়া সেই দুর্ভাগ্য আত্মাদের জন্য আর একটি বিচারের ব্যবস্থা করেন; (২) মানুষ অপরিণত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে প্রথম শরীরে যেমন কোন ভাল ও সৎকার্য করিবার সময় পায় না তেমনি অপর একটি শরীর ধারণ করিয়া যাহাতে সৎকার্য করিতে পারে সেরূপ সুযোগ তাহাকে অবশ্যই দিতে হইবে; (৩) দুশ্চরিত্র লোকের আত্মা কখনও কখনও পরলোকে ভীষণতম

শাস্তি পাইবার ভয়ে তাহা এড়াইয়া এই জগতেই সে শাস্তি ভোগ করিবার জন্য অন্য একটি শরীরের আশ্রয় গ্রহণ করে।[১০]

খৃষ্টধর্মের ভিতরও এই পুনর্জন্মবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। অরিগেন (Origen) এবং অন্যান্য যাজকমণ্ডলী এই মতবাদ বিশ্বাস করিতেন। অরিগেন বলিয়াছেন : 'কারণ করুণাময় ঈশ্বর দোষ ও গুণ অনুসারে বিচার করিয়া তাঁহার প্রাণীগণের বিচিত্র মনগুলিকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি স্থানে একত্রিত করিয়াছিলেন। তিনি এই ভিন্ন ভিন্ন পাত্র, মন বা আত্মাগুলিকে দিয়া তাঁহার বিরাট রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদে যে কেবল সুবর্ণ ও রজত পাত্রই ছিল তাহা নহে, কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার পাত্রও ছিল। সে সকলের দ্বারা যাহাকে যেরূপ সম্মান অথবা অসম্মান প্রদর্শন করা উচিত তিনি তাহাই করিতেন, আর এজন্যই জগতের বৈচিত্র্য সম্ভবপর হইয়াছে। তবে ঈশ্বর যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, মন ও প্রকৃতি, তদনুযায়ী প্রত্যেককে বিভক্ত করেন।' তিনি আরও বলিয়াছেন : 'আমার মনে হয়, ইহাও একটি প্রশ্ন যে, কেমন করিয়া মানুষের মন একবার ভাল ও একবার মন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া আমি বিশ্বাস করি, মানুষের এই ভাল মন্দ হইবার কারণ তাহার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার অনেক পূর্বে বর্তমান ছিল'।[১১]

১০। কমেনটারী অন্ ড্যুটারোনমি, ২৫প ভাগ, ৫ বক্তব্য।

১১। অরিগেনের এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য যে, তিনি মানুষের ভাল ও মন্দের জন্য নিশ্চয় কর্মফল স্বীকার করিতেন। স্থূলশরীর লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করা অবশ্য কর্মফল বা বাসনার জন্যই হইয়া থাকে ; কিন্তু

প্রাচীন খৃষ্টানদের ভিতর এই পুনর্জন্মবাদ এমনই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যাহার জন্য ৫৩৮ খৃষ্টাব্দে কন্সতান্তিনোপলের সভা (Council of Constatinople) আইন পাশ করিয়া তবে তাহার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সভায় আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল: যে কেহ আত্মার লোকান্তরবাদ রূপ কাল্পনিক অভিনয়কে এবং আত্মা মৃত্যুর পর পুনরায় ফিরিয়া আসে এই অদ্ভুত মতবাদকে সমর্থন করিবে ঈশ্বর তাহার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করিবেন।' নষ্টিক ও ম্যানিচিয়ান ধর্ম-সম্প্রদায় (Gnostics and Manichaeans) পুনর্জন্মবাদের মূলতত্ত্ব বেগোমাইল ও পলিসিয়ানদের (Begomiles and Paulicians) ন্যায় মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়ের ভিতরও প্রচার করিয়াছিলেন। তথাকথিত প্রমাদপূর্ণ বিশ্বাসকে মানিয়া লইবার জন্য কয়েকটি সম্প্রদায় ৩৮৫ খৃষ্টাব্দে নির্মম নির্যাতন পর্যন্ত ভোগ করিয়াছিল।

শপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা যায়, ডাঃ হেন্‌রী মোর (Dr. Henry More) প্রমুখ কয়েকজন কেম্ব্রিজ প্লেটোবাদীগণ[১২] এই লোকান্তরবাদের ধারণাকে মানিয়া লইয়াছিলেন। মধ্যযুগীয় এবং বর্তমানের বেশীর ভাগ জার্মান দার্শনিকও জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করিতেন। এই মতবাদ তাঁহারা প্রচারও করিতেন। কাণ্ট্, স্কোটাস্, শেলিঙ্, ফিক্টে, লিবনিজ্, সোপেনহায়ার, গিয়ার্ডনো ব্রুণো,

---

শরীরের জন্মগ্রহণের সঙ্গে ভাল-মন্দ কর্মফলের কোন আপেক্ষিক সম্বন্ধ নাই। জন্মগ্রহণের পূর্বেও কর্মফলের অস্তিত্ব থাকেও কর্মফলই মানুষকে সুখ অথবা দুঃখ দেয়, দুষ্কৃতি বা সুকৃতি দান করে।

১২। কেম্ব্রিজ সম্প্রদায়—যাঁহারা প্লেটোর মতকে বিশ্বাস করিতেন।

গেটে, লেসিঙ্, হার্ডার এবং অন্যান্য দার্শনিকদের রচনাবলী হইতেও পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে বহু উদ্ধৃতিই দেখান যাইতে পারে। নাস্তিক দার্শনিক হিউমও তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'আত্মার অমরত্ব' (*The Immortality of the Soul*) নামক রচনাটিতে উল্লেখ করিয়াছেন: 'সুতরাং পুনর্জন্মবাদ এমনই ধরণের একটি পদ্ধতি যাহার সহিত দর্শনশাস্ত্রের যুক্তির মিল হইতে পারে।' ফ্লামারিয়ান (**Flamarion**) ও হাক্সলির (**Huxley**) ন্যায় বৈজ্ঞানিকগণও এই লোকান্তরবাদ সমর্থন করেন। অধ্যাপক হাক্সলি বলিয়াছেন: একমাত্র অসংলগ্ন অযৌক্তিকতার কারণ দেখাইয়া অবিবেচক ব্যক্তি ব্যতীত এই মতবাদকে কেহ অস্বীকার করিবে না। ক্রমবিকাশবাদের ন্যায় পুনর্জন্মবাদও বাস্তব জগতে সত্য বলিয়া পরিগণিত।[১৩]

ধর্মতত্ত্ব-প্রচারকদিগের কেহ কেহ এই পুনর্জন্মবাদ প্রচার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জার্মান ধর্মশাস্ত্রবিৎ ডাঃ জুলিয়াস্ মূলারও (**Dr. Julius Muller**) তাঁহার 'পাপের ক্রিশ্চানদিগের অনুযায়ী তত্ত্ব' (*The Christian Doctrine of Sin*) নামক পুস্তকে এই লোকান্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। ডাঃ ডোর্ণার, আরনেষ্টি, রুকার্ট, এডোয়ার্ড বিচার্, হেন্‌রী ওয়ার্ড বিচার্ ও ফিলিপ্স্ বুকস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণও মানুষের মৃত্যুর পর জীবাত্মার অস্তিত্ব ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহা সমর্থন ও প্রচার করিয়াছেন। সোয়েডেন্‌বর্গ

১৩। ইভোলিউসন্ এ্যাণ্ড্ এথিকস্, পৃঃ ৬১

এবং ইমার্সনও এই মতবাদ বিশ্বাস করিতেন। মনীষী ইমার্সন তাঁহার 'অভিজ্ঞতা' (*Experience*) নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন : 'আমরা জাগ্রত হইয়া দেখি, একটি সোপানের উপর পড়িয়া রহিয়াছি। আমাদের নীচেও অনেক সোপান আছে এবং মনে হইল ঐগুলি ইতিপূর্বে আমরা অতিক্রম করিয়াছি। আমাদের উপরেও অনেক সোপান আছে; অনেকে উহার উপর দিয়া আরও ঊর্ধে ও দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যান।'

কি পুরাতন অথবা কি নূতন প্রায় সকল কবিই এই পুনর্জন্মবাদকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার 'অমরত্বের ইঙ্গিত' (*Imitations of Immortality*) নামক কবিতায় বলিয়াছেন :

'আমাদের সাথে যেই আত্মার উদয়
জীবন আকাশে ভায় তারকার মত,
অস্তগামী হয়ে দূর অগোচরে যায়,
আবার নূতন রূপে হয় আবির্ভূত।'

টেনিসনও তাঁহার 'দুইবাণী' (*Two Voices*) কবিতায় লিখিয়াছেন,

'অতিনিম্ন অভিব্যক্তি-স্তর হতে আমি
উচ্চ হতে আরো উচ্চতর অতিক্রমি,
যদি আমি এসে থাকি তবে যাবো ভুলে
বিগত দুর্ভাগ্যে মম যেন বাল্যকালে
অতীত ঘটনাগুলি লোকে ভুলে যায়,
চিত্তের মাঝারে স্মৃতি নাহি দেখা দেয়।'

ওয়ালট্ হুইটম্যান তাঁহার 'তৃণগুচ্ছ' (*Leaves of Grass*) কবিতায়ও প্রকাশ করিয়াছেন :

'হে জীবন জানি আমি তুমি বহুবার,
মৃত্যুরে ফেলিয়া পিছে এলে আরবার।
তাই আমি করি নাকো কখন সংশয়,
লক্ষবার মৃত্যু সাথে মোর পরিচয়।'

প্রায় বিভিন্ন দেশের কবিগণের কবিতা হইতে লোকান্তর-বাদের ইঙ্গিত ও কথা তুলিয়া দেখান যাইতে পারে। এমন কি আফ্রিকা, এসিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভিতরেও এই মতবাদের প্রচলন আছে।

আত্মার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস করে ইহার নিদর্শন যথেষ্ট পরি-মাণে সর্বত্র পাওয়া যায়। এসিয়ার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (three-fourths) লোকই এই পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস করে এবং এই ইহার ভিতর হইতে জীবন-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানও তাহারা লাভ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া একথা ঠিক যে, পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নাই যাহা মানুষের মৃত্যুর পর তাহার আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেনা; মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা বা সূক্ষ্মদেহ যে থাকে একথা সকল ধর্মই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে।

পুনর্জন্মে যাহারা বিশ্বাস করে না তাহারা বৈষম্য ও বৈচিত্র্য-পূর্ণ জগতকে একজন্মবাদ অর্থাৎ মানুষ একবার মাত্রই জন্মগ্রহণ করে ও তাহার আত্মার কোন অস্তিত্ব নাই একথা বিশ্বাস করে; অথবা বংশপরম্পরাগত সংক্রমনরূপ মতবাদের অজুহাৎ দেখাইয়া তাহারা জন্মান্তরের ব্যাখ্যা করিবার জন্য চেষ্টা করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি মতবাদের পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই, কেননা এই দুইটি মতবাদের কোনটিই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বৈষম্যকে বুঝাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। একজন্মবাদ বলিতে একজন্মবাদীরা বুঝিয়া থাকে যে, এই সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষের জন্য মানুষের আত্মা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা একথা বুঝে না, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শুধু তাহাই নহে, বহু সমস্যার সমাধানও তাহারা করিতে পারে না। যেমন, বালক-বালিকারা অল্প বয়সে মৃত্যুর পর কেন পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে ও কেনই বা কোন-কিছুর অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করিবার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; অথবা কিছুদিনের জন্য এই জগতে গভীর অজ্ঞানের ভিতর থাকিয়া কোন জ্ঞান অর্জন না করিয়াই কেন শিশুদের আত্মা চলিয়া যায় এবং ইহার দ্বারা তাহাদের কি উদ্দেশ্যই বা সাধিত হয় ইহা তাহারা জানে না। একজন্মবাদে বিশ্বাসী খৃষ্টান-ধর্মমতও এই কথা বলিয়া বুঝাইতে চায়, যে সমস্ত শিশু অল্প বয়সে অথবা জন্মিবামাত্র মরিয়া যায় তাহাদের আত্মা মুক্তিলাভ করে, কারণ মৃত্যুর পর তাহারা স্বর্গে গমন করে এবং সেখানে তাহাদের অনন্ত জীবন ও শাশ্বত সুখ-শান্তি ভোগ হয়। সুতরাং যে সকল শিশুসন্তান ঠিক জন্ম-গ্রহণের পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের জন্য একজন্মবাদে বিশ্বাসী খৃষ্টানদের স্বর্গস্থ পিতা অর্থাৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত এবং শিশুদের মর্ত্য শরীর যখন আবার সমাধিস্থ করা হয় তখন কল্যাণময় ঈশ্বরকে তাহাদের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া

কর্তব্য। মোটকথা, এ কথা অতি সত্য যে, খৃষ্টানধর্মীদের একজন্ম-বাদ এ সকল রহস্যের কোন-কিছুই সমাধান করিতে পারে না।

দুইটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম—ইহুদীয়ধর্ম ও তাহার দুইটি শাখা খৃষ্ট ও ইস্‌লাম ধর্ম এবং জেরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম এখনও একজন্মবাদ বিশ্বাস করে। এই ধর্মগুলির মতাবলম্বীরা একজন্মতত্ত্বের সকল-কিছু অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্ধভাবে বিশ্বাস করে যে, মানুষের আত্মা শরীর ধারণ করিয়া জন্মিবার সময় শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং পৃথিবীতে যতটুকু সময় বাঁচিয়া থাকিয়া তাহারা কর্ম করিয়াছে তাহার সুফল ভোগ করিয়া শান্তিলাভ অথবা কুফল গ্রহণ করিয়া দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য অনন্তকাল ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিবে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কেন তবে বিশ্ব-নিয়ন্তা ভগবানের ইচ্ছাতে বাধ্য বা পূর্বনির্দিষ্ট হইয়া কর্ম করিয়াও মানুষের আত্মা অনন্তকাল ফলভোগের জন্য বাধ্য থাকিবে? ভগবানের ইচ্ছা বা করুণাতেই যখন মানুষ জগতে থাকিয়া কর্ম করে তখন ফলভোগের জন্য কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা ও করুণা দায়ী না হইয়া মানুষের আত্মাও দায়ী না হইবে কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা ও করুণা বলিতে ঈশ্বরই কর্তা ও নিয়ন্তা, মানুষ যন্ত্র মাত্র, সুতরাং কর্ম এবং তাহার ফলভোগের জন্য ঈশ্বরই সম্পূর্ণ দায়ী থাকা উচিত—মানুষ নয়। অতএব এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, এ সকল জটিল সমস্যার সমাধান না করিয়া বরং নিয়তি ও কৃপাবাদ অন্যায় ও পক্ষপাতিত্ব দোষের

জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সগুণ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর শূন্য হইতে যদি সকল মানবাত্মাকে স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে তাঁহার কর্তব্য নয় কি—সকল আত্মাকেই সমানভাবে সংস্বভাবসম্পন্ন ও সুখী করা? কেন তিনি তবে একজনকে সুখ-শান্তিময় জীবন ভোগ করাইয়া অপরকে অনন্তকাল ধরিয়া দুঃখ-যন্ত্রনার বোঝা বহন করাইয়া থাকেন? কেনই বা তবে তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে একজন লোক ভাল প্রবৃত্তি লইয়া আর অন্যজন খারাপ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে? কেনই বা তাহা হইলে সমগ্র জীবন ভরিয়া একজন ধর্মভাবে সাধুর ন্যায় এবং অপরে পশুপ্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া দুর্জনের ন্যায় জীবন যাপন করে? কেনই বা একজন বুদ্ধিমান হইয়া জন্মায় ও অপরে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অথবা মূর্খ হইয়া জন্মগ্রহণ করে? সুতরাং সত্যই যদি ঈশ্বর নিজে এই সকল বৈষম্য ও অসম্পূর্ণতা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, অথবা একজনকে অনন্ত দুঃখ-যন্ত্রনার অধিকারী করিয়া ও অপরকে চিরকাল সুখভোগ করিবার জন্য সৃষ্টি করেন তবে বলিতে হইবে তিনি একদেশদর্শী। প্রকৃত কথা, এই সব গভীর রহস্যের সমাধান করিতে একজন্মবাদিগণ সক্ষম হয় না। তাহারা বরং চিন্তা করে—ঈশ্বর একজন নির্মম অত্যাচারী অপেক্ষাও অধম, সেজন্য তিনি কখনই পূজ্য ও উপাস্য হইতে পারেন না। আর তাহা হইলে ন্যায়পরায়ণ ও দয়াময়ই বা আমরা ঈশ্বরকে কেন বলিব?

কেহ কেহ ঈশ্বরকে এই অন্যায় ও পক্ষপাতিত্ব দোষ হইতে

মুক্ত করিবার জন্য বলেন যে, ভাল যাহা সমস্তই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মন্দের জন্ম দায়ী সয়তন। ভাল বা কল্যাণময় কাজ ও দ্রব্যমাত্রেই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, আর জগতে যাহা অকল্যাণ তাহা সয়তান সৃষ্টি করিয়াছে। মোটকথা অশুভ যাহা-কিছু সমস্তই সয়তানের সৃষ্টি। কিন্তু এই সমস্ত কথা কতদূর যুক্তিযুক্ত আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। যথার্থভাবে দেখিতে গেলে, শুভ ও অশুভ অথবা ভাল ও মন্দ ইহারা তুইটি আপেক্ষিক শব্দ, একটি থাকিলে অপরটি থাকিবে, স্নুতরাং একটি অপরটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় ভাল কখনও মন্দকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, মন্দও কখনও ভালকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। স্নুতরাং ঈশ্বর যখন 'ভাল' সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তিনি 'মন্দ'-কেও ভালর সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাই বুঝিতে হইবে। কেননা শুধুই ভাল অথবা শুধুই মঙ্গলকে ঈশ্বর কখনও সৃষ্টি করিতে পারেন না। অথবা যদি আমরা স্বীকার করি যে, অকল্যাণ যত-কিছু সমস্তই মন্দের সৃষ্টিকর্তা সয়তান পৃথিবীতে বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা হইলে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সৎ-এর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সহিত একসঙ্গে থাকিয়া সয়তান মন্দ বা অসৎ সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। কেননা ভাল যখন মন্দকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—উভয়ে পরস্পর আপেক্ষিক, তখন ঈশ্বরের পক্ষে ইহা একান্ত অস্বাভাবিক ও অসম্ভব যে, মন্দের সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি একা কেবলমাত্র ভালকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। স্নুতরাং

এই ধরণের মতবাদ যাহারা বিশ্বাস করেন তাহাদিগকে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জগতই যখন ভাল ও মন্দ—সুখও দুঃখের সংমিশ্রণ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তখন জগৎ সৃষ্টি করিবার সময়ে নিশ্চয়ই উভয়ের সৃষ্টিকর্তা একসঙ্গে বসিয়া ভাল ও মন্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন? ফলে ইহাই তাহা হইলে দাড়াইবে যে, উভয়ের সৃষ্টিকর্তার সমান শক্তিশালী এবং পরস্পর পরস্পরেরও অধীন—স্বাধীন মোটেই নন! কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে—দুইজন সৃষ্টিকর্তার মধ্যে কেহই অমিতশক্তিসম্পন্ন বা সর্বশক্তিমান নহেন, কেননা উহারা পরস্পর পরস্পরের অধীন ও মুখাপেক্ষী; কাজেই একথা মানিতে আমরা বাধ্য নই যে, সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ামক ঈশ্বর কেবল ভালর সৃষ্টিই করিয়াছেন, মন্দের সৃষ্টি আদৌ করেন নাই।

পুনর্জন্মবাদের সমর্থন করিয়া বেদান্তবাদীরা বলেন: জগতে কোন জিনিসেরই ধ্বংস নাই। বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যেমন স্বীকার করেন যে, কোন জিনিসেরই নাশ হয় না, একটি রূপের পরিমাণ বা আকার নষ্ট হইলেও তাহা অন্য রূপ, পরিমাণ বা আকারে থাকিয়া যায়, বেদান্ত দার্শনিকগণও ঠিক তেমনি কথা বলেন, কারণ সকল জিনিস যে শাশ্বত ঈশ্বর ও অবনশ্বর ইহা তাঁহারা ভাল ভাবেই জানেন। বেদান্তদর্শন স্বীকার করে: 'না সতো বিদ্যতে ভাবোনা ভাবো বিদ্যতে সতঃ'; অর্থাৎ যাহা কোনদিনই উৎপন্ন হয় না তাহা কখনও সৎ বা 'আছে' হইতে পারে না, আর যাহা সৎ বা চিরদিনই আছে তাহাও কখনো অসৎ

বা 'নাই' হইতে পারে না[১৪] ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। সংস্কার—যাহা আমাদের সকলের আছে এবং শরীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার শক্তি কোনটিই কখনও নষ্ট হইবে না, পরন্তু কোন-না-কোন আকারে আমাদের মধ্যে তাহারা থাকিবে। আমাদের শরীরের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু শারীরিক কোন শক্তি, কর্ম অথবা সংস্কার এবং যে সমস্ত পদার্থের উপাদানে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে সে সকল অব্যক্ত আকারে আমাদের মধ্যেই থাকিবে, কোনদিন তাহাদের ধ্বংস হইবে না। বিজ্ঞানও ইহা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে। বিজ্ঞানও বলে: যাহা অব্যক্ত আকারে অথবা বীজাকারে থাকে তাহা একদিন না একদিন ব্যক্ত ও কার্যের আকারে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং একটি শরীর ধ্বংস হইয়া গেলেও শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক অন্য একটি শরীর আমরা পুনরায় গ্রহণ করিব। ভগবদ্গীতায়ও বলা হইয়াছে: 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'[১৫] অর্থাৎ কোন জিনিসের জন্ম থাকিলে তাহার মৃত্যু থাকিবে এবং মৃত্যু থাকিলে জন্মও থাকিবে, কারণ উভয়ে পরস্পর আপেক্ষিক। জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত ধারাবাহিক চক্রের ভিতর দিয়া সকল মানবাত্মাকে অতিক্রম করিতে হইবে।

১৪। এই কথা সাংখ্যকার কপিলও স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যসূত্রে 'নাশ' কথার অর্থ বলিতে গিয়া কারণে অর্থাৎ জিনিস যেখান হইতে উৎপন্ন হয় সেখানেই পুনরায় ফিরিয়া যায়, বলা হইয়াছে; যেমন, 'নাশঃ কারণ লয়ঃ', কিন্তু একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না।

১৫। গীতা ২।২৭

আরও একটি ভাবিবার বিষয় যে, জন্মের আরম্ভ, সমাপ্তি ও ক্রমানুবর্তন সমস্তই মানুষের মানসিক চিন্তা বা ধারণা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইহাদের সার্থকতাও আবার কাল বা সময়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, কাল বা সময়ের নিজের কোন নিত্য বা পারমার্থিক সত্যতা নাই। প্রকৃতি বা জাগতিক বস্তুর সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ তাহার মাত্র জ্ঞান বা জ্ঞানের আকারের নামই 'কাল'। মৃত্যুরূপ নিদ্রা অর্থাৎ চিরনিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে কালের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়। মৃত্যুকে আমাদের সুষুপ্তির সঙ্গে তুলনা করা যায়। সুদীর্ঘ কঠোর শীত ঋতুর নিদ্রা সমাপ্ত করিয়া পতঙ্গরা যেরূপ বসন্ত ঋতুর আগমনে জাগ্রত হয়, অথবা প্রজাপতি যেরূপ শরৎকালে তাহার গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া আসে, মানুষের আত্মাও সেরূপ মৃত্যুরূপ নিদ্রা হইতে পুনরায় জাগ্রত হয়। এই জাগ্রত হওয়ার নামই জন্ম। বসন্তকালে গুটিপোকা নিজের গুটি হইতে বাহির হইয়া প্রজাপতির আকারে নবজন্ম গ্রহণ করে, আর এই প্রাকৃতিক রূপ-পরিবর্তন হইতেই আমরা পুনর্জন্ম এবং সুষুপ্তি ও মৃত্যুর সম্পর্ক এবং তাহাদের সাদৃশ্য-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। জন্ম ও মৃত্যু জীবাত্মার রূপান্তর মাত্র।

আমরা যেমন জীর্ণ ও পুরাতন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করি, মৃত্যুর পর মনুষ্যের আত্মাও তেমনি গভীর নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহার নূতন শরীরে নূতন পোষাক-পরিচ্ছদ যেন পরিধান

করে।[১৬] সুতরাং কার্য-কারণসূত্রের অধীন হইয়া মানুষের আত্মা এ মনুষ্য-জগতেই হৌক বা অন্য কোন প্রাণী-জগতেও হোক বারম্বার জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। কবি ড্রাইডেন (Dryden) 'অভিদ্' নামে পাইথাগোরসের সম্বন্ধে যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাতেও এ কথা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন,

'নূতনের আবরণে আসে পুরাতন
এই তো মরণ। অগণিত দেহ-আবরণে
বহুজন্ম ধরে নানা তরঙ্গের মাঝে
যদিও আত্মার গতি, তবুও তাহার নাহি বিনাশ বিকার,
সে যে ধ্রুব অবিচল,
যাহা যায় ধ্বংস হয়ে
সে শুধু এ বাহ্যরূপ নশ্বর—শরীর।'

এখানে অবশ্য জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে যে, পৃথিবীতে জন্মিবার পূর্বেও যদি আমাদের অস্তিত্ব থাকে, তবে পূর্বজন্মের সমস্ত বিষয়কে আবার আমরা স্মরণ করিতে পারি না কেন? অবশ্য পুনর্জন্মবাদের বিরুদ্ধে ইহা একটি কঠিন প্রতিবাদ বলা যায়। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে।

১৬। গীতাতে ঠিক এই উদাহরণটিই দেওয়া হইয়াছে:

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতী নবানি দেহী॥'

—গীতা ২।২২

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, প্রাণীদের আত্মাও সেরূপ জীর্ণ পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর আবার গ্রহণ করে।

কতকগুলি লোক অতীতের ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না বলিয়াই আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। যাহারা আবার স্মরণশক্তিকে আত্মার থাকা বা না থাকার একমাত্র মাপ-কাঠি বলিয়া মনে করে তাহারা বলেঃ মৃত্যুর সময়ে যদি স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, তবে আমাদের অস্তিত্ব কখনই থাকিতে পারে না, আর সেজন্য আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের আত্মার কোন-না-কোন সময়ে মৃত্যু হইবে, তাহা অমর হইতে পারে না, কারণ আমাদের মতে স্মৃতিশক্তিই আত্মার থাকা বা না থাকার মাপকাঠি ও প্রমাণ। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, স্মৃতি বা স্মরণশক্তি যদি আমাদের না থাকে তবে আমরা যে একই লোক বা একই আত্মা তাহা নির্ধারণ করিবে কে ?

বেদান্ত ও যোগদর্শন কিন্তু এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছে। যোগদর্শনের মতে পূর্বজন্মের অস্তিত্ব অবশ্যই স্মরণ করা যায়। পতঞ্জলির যোগদর্শন যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন, তৃতীয় অধ্যায়ের ১৮শ সূত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেনঃ "সংস্কারসাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্" ; অর্থাৎ সংস্কারসমূহে মনোনিবিষ্ট করিলে পূর্ব-পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়।[১৭] এখানে 'সংস্কার' বলিতে

১৭। এখানে 'সংস্কার' অর্থে দুই প্রকার সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে, যেমন,

(১) অনুভব ও অবিদ্যাদি জন্য, (১) কর্ম জন্য ধর্মাধর্মরূপ সংস্কার। এই উভয়বিধ সংস্কারের সংযম ও অভ্যাস করিলে সাক্ষাৎকার অর্থাৎ মনকে নিবিষ্ট করিয়া নিজের ও এমন কি পরেরও পূর্ব-পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। এ সম্বন্ধে ব্যাসভাষ্যে ভগবান জৈগীষব্যের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের মনের অচেতন স্তরে অতীত জীবনের যে সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ছাপ সুপ্ত বা অব্যক্ত আকারে থাকে তাহাদিগকে বুঝায়। এই অব্যক্ত ও সুপ্ত সংস্কারগুলির কোনদিন নাশ হয় না। ঐ সমস্ত সুপ্ত সংস্কার আমাদের মনের চেতন স্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিলে উহাদিগকে আমরা 'স্মৃতি' বা 'স্মরণশক্তি' বলি। রাজযোগীরা মনের অচেতন স্তরে সুপ্ত সংস্কারগুলির উপর মনঃসংযোগ করিয়া অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারেন। ভারতবর্ষে এরূপ যোগীদের উদাহরণের অভাব নাই। তাঁহারা কেবল নিজেদেরই নয়, অন্যের অতীত জীবনের ঘটনাসমূহও বলিয়া দিতে পারেন। কথিত আছে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার অতীত পাঁচশত জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারিতেন।

জীবিতকালে আমরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যে সমস্ত সংস্কার উৎপন্ন করি সেগুলি বীজাকারে আমাদের মনের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত থাকে। বেদান্তে বলা হইয়াছেঃ ঐ সমস্ত সংস্কার একত্রিত হইয়া চিত্ত তথা অন্তঃকরণে সঞ্চিত হয়। 'চিত্ত' বা অন্তঃকরণ বলিতে প্রত্যেক মানুষের মনের অব্যক্ত অথবা অবচেতন স্তরকে বুঝায়। মনের ঐ অবচেতন স্তরে আমাদের সকল রকমের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংস্কার সঞ্চিত ও লুক্কায়িত থাকে। অনুকূল অবস্থা পাইলে অবচেতন স্তরের সুপ্ত সংস্কার-

জৈগীষব্য দশ মহাকল্পের জন্ম-পরম্পরার জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতে জড়ভরত এবং ভগবান বুদ্ধদেবের জাতিস্মরতার কথাও উল্লেখযোগ্য।

গুলি জাগ্রত হয় এবং আমাদের চেতন স্তরে উদিত হইয়া কার্যাকারে প্রকাশ পায়। উদাহরণ যেমন, একটি অন্ধকার ঘরে কাপড়ের পর্দার উপর কাচফলকের সাহায্যে কতকগুলি ছবি প্রতিফলিত করা হইল। ঘরটিকে সংপূর্ণরূপে অন্ধকার করা হইল আর আমরা ছবিগুলির দিকে চাহিয়া আছি। হঠাৎ একটি জানালা খুলিলে দ্বিপ্রহরের সূর্যালোক আসিয়া পর্দাটির উপর পড়িল। সুতরাং একথা ঠিক যে, পর্দায় প্রতিফলিত ছবিগুলিকে আর আমরা দেখিতে পাইব না; কারণ লণ্ঠন বা বৈদ্যুতিক অপেক্ষা সূর্যের আলোক আরও প্রখর, সুতরাং সূর্যালোক অপেক্ষা অল্পালোকবিশিষ্ট লণ্ঠন বা বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা প্রতিফলিত ছবিগুলিকে একেবারে নিষ্প্রভ করিয়া দিবে। সত্যই পর্দায় ছবি গুলিকে আর আমরা দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু তাহা হইলে কি বলিতে হইবে ছবিগুলির অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? না, তাহা নহে, ছবিগুলির অস্তিত্ব কাপড়ের পর্দায় ঠিকই আছে, কেবল প্রখর সূর্য-কিরণের জন্য উহারা আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে না। ঠিক সেরূপ আমাদের মনের অবচেতন স্তররূপ পর্দার উপরে অসংখ্য অতীত জীবনের ঘটনাবলীর ছাপ সংস্কারের আকারে সঞ্চিত রহিয়াছে। তাহারা আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, কিন্তু ঐ সমস্ত সংস্কার অবচেতন স্তরেই সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অথচ সংস্কারগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? তাহার কারণ, আরও শক্তিশালী জাগ্রত ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান ঐ সুপ্ত সংস্কারগুলিকে অভিভূত করিয়া রাখে, বহির্জগতের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে মন আবদ্ধ থাকায়

অন্তর্জগতে অবচেতন মনের সংস্কারগুলি সম্বন্ধে মনের আর অনুভূতি হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়রূপ দরজা ও জানালাগুলি বন্ধ করিয়া যদি বহির্জগতের বিষয়-সকলের সহিত মনের সংযোগ ছিন্ন করিয়া দিই এবং সংগে সংগে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি রুদ্ধ করিয়া মনকে স্থির ও কেন্দ্রীভূত করিতে পারি তবেই চৈতন্যের আলোকে একাগ্র মনের দ্বারা অতীত জীবনের সমস্ত স্মৃতি, ঘটনা ও অভিজ্ঞতা-বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারিব। কাজেই যাঁহারা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে এবং পূর্ব-পূর্ব জীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চান তাঁহাদিগের পক্ষে রাজযোগ শিক্ষা ও অভ্যাস করা উচিত। তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পথ অবরুদ্ধ করিয়া মনকে একাগ্র করিবার কৌশল বা প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে। তবে এ কথা ঠিক যে, একাগ্রতাশক্তি লাভ করিতে হইলে আত্মসংযম শিক্ষা না করিলে চলিবে না। আত্মসংযম অর্থে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর সংপূর্ণ প্রভুত্ব লাভ করা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে আমাদের ইচ্ছার বশীভূত করা বুঝায়।

যে প্রসুপ্ত সংস্কারগুলিকে লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহাদের আমরা স্মরণ করি অথবা না করি সেগুলিই আমাদের প্রত্যেকের চরিত্র গঠন করিবার প্রধান উপায়। তাহা ছাড়া আমাদের চতুর্দিকে এত যে বৈষম্য ও বৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহাদের কারণও ঐ সুপ্ত সংস্কাররাশি। সংস্কার কাহারও কখনও নষ্ট হয় না; সংস্কার প্রতিজন্মেই অনুবর্তন করে এবং ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, পূর্বজন্ম এবং আত্মার অস্তিত্ব মৃত্যুর পরও থাকে।

মৃত্যুর পর আত্মার যে অস্তিত্ব থাকে একথা প্রতিভাবান ও অসাধারণ ব্যক্তিদিগের চরিত্র অনুশীলন করিয়া দেখিলে অবশ্যই তাহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। আমরা পূর্ব-পূর্ব জীবনে যে সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করি সেগুলি বর্তমান জীবনে প্রকাশ বা অভিব্যক্ত হয় মাত্র। বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির স্মৃতি নিশ্চয়ই তত আবশ্যকীয় নয়। যদি কোন-কিছুর জ্ঞান আমরা পূর্বজন্মে অর্জন করি তবে বিশেষ কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা অথবা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমরা স্মরণ করি বা না করি তাহাতে কিছু আসে যায় না। ঐ সমস্ত বিশেষ ঘটনাগুলি কিংবা বিষয়ের জ্ঞান হয়তো আমাদের স্মৃতিপথে কখনও না উঠিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের এতটুকুও নষ্ট হয় না, তাহারা থাকিয়াই যায়। যেমন আমরা যদি আমাদের বর্তমান জীবনকে অনুশীলন করিয়া দেখি তবে দেখিব যে, পূর্বাপেক্ষা কিছু-না-কিছু বেশী অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান আমরা লাভ করিয়াছি। পূর্ব-পূর্ব জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী অথবা কর্মের স্মৃতি হয়তো আমাদের মন হইতে একেবারে মুছিয়া যাইতে পারে, কিন্তু একথা সত্য যে, ঐ সমস্ত ঘটনা হইতে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিয়াছি সেগুলি নষ্ট হইবে না—থাকিবে এবং সেগুলিই আমাদের বর্তমান জীবনের চরিত্রকে বিভিন্নভাবে গঠন করে। আমরা যে উপায়ে বিচিত্র বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি সেগুলি আমাদের স্মরণপথে আর নাও আসিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের স্মরণ করিবারও

কোন প্রয়োজন হয় না, যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিয়াছি ইহাই যথেষ্ট।

ইহা ছাড়া আমাদের মধ্যে এমন সব লোক আছে, যাহারা অলৌকিক শক্তিসমূহকে লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উদাহরণ যেমনঃ আত্মসংযম-শক্তির কথা বলা যাইতে পারে। একজন হয়তো আত্মসংযমের অসাধারণ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু অপরে বৎসরের পর বৎসর বিশেষভাবে যত্ন এবং চেষ্টা করিয়াও হয়তো ঐ শক্তি লাভ করিতে পারে না। এখন এই প্রশ্ন হইতে পারেঃ কেন এরূপ প্রার্থক্য বা বৈষম্য হয়? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিলব্ধ ভগবদ্‌জ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়স যখন তাঁহার চারি বৎসর মাত্র তখনই তিনি সমাধির উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। অথচ এই সমাধি যোগীদিগের পক্ষেও লাভ করা কত কঠিন! আমরা একজন যোগীপুরুষকে[১৮] জানি—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বয়ঃবৃদ্ধ; বিচিত্র শক্তি বা বিভূতিও তিনি জীবনে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দেখিয়াই বলিয়াছিলেনঃ 'আমি যে সমাধি লাভ করিতে ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছি সেই সমাধি তোমার অতীব সহজ ও স্বাভাবিক।' এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যাহা হইতে

১৮। ইনিই যোগী ও বেদান্তী তোতাপুরী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন বেদান্তমতে সাধনা করেন তখন তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বেদান্ত-সাধনায় নির্দেশ দেন।

প্রমাণ হইবে—একমাত্র পূর্বজন্মই ইহার একমাত্র কারণ। কারণ একথা ঠিক যে, অতীত জন্মের স্মৃতির উপর নির্ভর না করিলেও পূর্বজন্মের সুপ্ত সংস্কারগুলিই আমাদের প্রত্যেকের চরিত্র গঠনের পক্ষে একমাত্র উপযোগী, আর অতীত জীবনের কোন-কিছুকে স্মরণ করিতে না পারিলেও অথবা বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির স্মৃতিশক্তি হারাইয়া ফেলিলেও আমাদের বিকাশ অথবা ক্রমোন্নতির কিছুই ক্ষতি বা গতিরোধ হয় না। স্মৃতি-শক্তি দুর্বল হইলেও আমাদের জীবন ক্রমাগতই বিকশিত ও উন্নত হইতে থাকে।

প্রতেক জীব বা প্রাণীর মনের (অন্তঃকরণের) অবচেতন স্তরে তাহার পূর্ব-পূর্ব জন্মের সংস্কাররাশি সঞ্চিত থাকে। এখানে দুইজন অনুরাগী বা ভালবাসার পাত্রের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে? ভালবাসা দুইজন ব্যক্তি বা প্রাণীর মধ্যে আকর্ষণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অথবা বলা যায় আত্মায় আত্মায় আকর্ষণের নামই ভালবাসা বা প্রেম। শরীরের মৃত্যুতে এই প্রেম বা ভালবাসার কখনও নাশ হয় না। প্রকৃত ভালবাসা মৃত্যুর পরও থাকে এবং তাহার বিকাশও উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। এই ভালবাসা দুইটি আত্মায় পরস্পর মিলন সাধন করিয়া দুইটিকে অভেদ ভাবাপন্ন করে।

দুইটি প্রাণীর প্রথম সন্দর্শনেই কেন একটি অপরের সহিত পরিচিত হয় এবং একটি অপরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয় এই রহস্যের সমাধান

একমাত্র পুনর্জন্ম-নীতিই করিতে পারে। পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ক্রমশই বাড়িতে থাকে ও ক্রমে তাহা প্রবল হয়। ভালবাসা অথবা অনুরাগের পাত্র যেখানেই থাকুক বা যাক্ না কেন, পরিশেষে তাহাদের মিলন হয়। সুতরাং বেদান্তের শিক্ষা ইহা নয় যে, শরীরের মৃত্যুর সংগে সংগেই অপরের প্রতি একজনের আকর্ষণ অথবা অনুরাগ নষ্ট হইয়া যায়, আত্মা যেরূপ অমর ও অবিনাশী, অনুরাগ বা ভালবাসারও সেরূপ নাশ নাই, অনন্তকাল ধরিয়া তাহা বিদ্যমান থাকে।

কিরূপে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে হয় এবং পূর্বজন্মের জ্ঞান লাভ করা যায় তাহার কৌশল যোগীরা জানেন। যোগীরা বলেনঃ দেশ ও কাল আমাদের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমরা যদি এই মানসিক অবস্থাকে কোনও রূপে অতিক্রম করিতে পারি তবে এখন যেরূপ চক্ষের সম্মুখে সকল-কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, ঠিক সেরূপ উন্নত ও বিকশিত মনে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল বস্তুরই জ্ঞান ভাসিয়া উঠিবে। তবে যাহারা উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া নিজেদের কৌতূহলই কেবল চরিতার্থ করিতে চায় তাহারা অবশ্য অতীত জীবনের ঘটনাগুলির স্মৃতি ফিরাইয়া পাইবার জন্য অযথা মানসিক শক্তি ক্ষয় করিতে পারে। আমার মনে হয়, ইহা অপেক্ষা আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠন এবং বর্তমানে যেরূপ আছি সেই অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার জন্য সময় ও শক্তিকে

নিয়োজিত করি তাহা হইলে জীবনে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হইতে পারি; কেননা পূর্বজন্মের স্মৃতি হয়তো আমাদের বর্তমান জীবনকে জোর করিয়া অন্যায়ের দিকে পরিচালিত করিতে পারে। যেমন কোন লোক যদি জানিতে পারে যে, পূর্বজন্মে সে অত্যন্ত খারাপ বা অন্যায় কার্য করিয়াছে, তবে সেই অন্যায় কার্যের জন্য সে চিন্তা করিবে এবং অনুতপ্ত হইবে; সুতরাং সে-কার্যের প্রতিক্রিয়াও তাহার এ জীবনেই আরম্ভ হইতে পারে, আর সেজন্য কয়েক দিন বা কয়েক মাসের জন্য নানাবিধ দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি বা মানসিক ও দৈহিক জ্বালা-যন্ত্রণাও তাহাকে অভিভূত করিতে পারে। তাহা হইলেই ভাবিয়া দেখুন—সেই পূর্বচিন্তার জন্য সে নিজেকে কতদূর দুর্ভাগ্য মনে করে! এইরূপ অযথা চিন্তা করিয়া লোকে অনেক সময় এতই বিচলিত ও অসুখী হইয়া পড়ে যে, পরিশেষে কোন কাজই সে নিয়মিতভাবে আর করিতে পারে না। বরং ক্রমাগতই সে ভাবিতে থাকে কখন দুঃখ-যন্ত্রণার তাড়না উপস্থিত হইয়া তাহাকে আবার জর্জরিত করিবে! সেই দুশ্চিন্তার জন্য সে ভাল করিয়া খাইতে অথবা নিদ্রা যাইতেও পারে না। তাহার অবস্থা সত্যই অতীব শোচনীয় আকার ধারণ করে! সুতরাং এই যে পূর্বজন্মের ঘটনা ও কার্যাবলী আমরা স্মরণ করিতে পারিতেছি না ইহা আমাদের পক্ষে পরম আশীর্বাদ স্বরূপ বলিতে হইবে। বেদান্তও এই কথা সমর্থন করে। বেদান্তও শিক্ষা দেয়: অযথা অতীত জীবনের স্মৃতি ও কার্যাবলীর চিন্তা করিয়া আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়। ক্রম-

বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলির পরিশ্রান্তিময় দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার সময় আমাদের পশ্চাদ্‌দিকে চাহিলে চলিবে না, দিব্যানুভূতিরূপ চরমলক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য আমাদের ক্রমাগত সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এরূপ অগ্রগতির দ্বারাই আমরা আমাদের অতীত জীবনের সকল ঘটনা ইচ্ছা করিলে জানিতে পারি, অথবা তাহারা আপনা হইতেই বরং আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আত্মজ্ঞান লাভ করিলে বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মজ্যোতির সম্মুখে জগতের কোন-কিছুই আর অপ্রকাশিত বা অবিদিত থাকে না। সর্বজ্ঞানের আকর আত্মোপলব্ধির সংগে সংগে দেশ ও কালের পরিচ্ছিন্নতা চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়া যায়। তখন অনন্ত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালে অনুষ্ঠিত সকল ঘটনা ও কার্যই আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়। তখনই ঠিক শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যেমন বলিয়াছিলেন,

'বহূনি মে ব্যতিতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥'[১৯]

হে অর্জুন, তুমি ও আমি উভয়ে বহুজন্ম অতিক্রম করিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও তোমাতে ও আমাতে পার্থক্য এই যে, তুমি পূর্ব-পূর্ব জীবন সম্বন্ধে কিছুই জান না, আর আমি সমস্তই জানি'—এই কথার যথার্থ মর্ম আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

১৯। গীতা ৪।৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বংশানুক্রমিকতা ও পুনর্জন্মবাদ ঃ

যাহারা বংশানুক্রমিকতায় (heredity) বিশ্বাস করে তাহারা মানুষের আত্মাকে স্থূলশরীর হইতে অতিরিক্ত একটি সত্ত্বা বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না, তাহারা বর্তমান জন্মের পূর্বেও আমাদের আত্মার অস্তিত্ব ছিল কি-না অথবা মৃত্যুর পরেও ইহার অস্তিত্ব থাকিবে কি-না এই সমস্ত প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতে আদৌ ইচ্ছুক নয়। মোটকথা এই ধরণের কোন প্রশ্নই তাহাদের মনে স্থান পায় না। সাধারণতঃ তাহারা স্থূলদেহ, মস্তিষ্ক অথবা স্নায়ুমণ্ডল হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া দেখিতে চায় না। তাহাদের মতে যাহাকে আমরা আত্মা, চেতনসত্ত্বা অথবা জ্ঞাতা বলিয়া মনে করি, দেহ বা মস্তিষ্কের উৎপত্তির সংগে সংগে আত্মারও উৎপত্তি হয়; যতদিন দেহ বা মস্তিষ্ক থাকে ততদিন আত্মা থাকে এবং দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবার সংগে সংগে আত্মাও একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু যাহারা পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস করে তাহারা আত্মাকে স্থূলশরীর হইতে অতিরিক্ত একটি চেতনসত্ত্বা বলিয়া স্বীকার করে। তাহা ছাড়া সমস্ত প্রাণীর আত্মার অস্তিত্ব মৃত্যুর পর এবং শরীর ধারণ করিবার পূর্বেও থাকে একথা তাহারা বিশ্বাস করে।

সমস্ত যুগের জড়বাদী বৈজ্ঞানিক, নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদীরা এই বংশানুক্রমিক নীতি সমর্থন করেন। শুধুই তাহাই নয়, যাঁহারা সৃষ্টি-বিষয়ে আরম্ভবাদ (special creation) বিশ্বাস করেন, অর্থাৎ যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ঠিক নির্দিষ্ট কোন একটি সময়ে আদিপুরুষ ঈশ্বর আদম ও নারী ইভকে সৃষ্টি করিয়া বংশপরম্পরার মধ্য দিয়া সমগ্র মনুষ্য-সমাজের ভিতর তাঁহাদের গুণরাশি, প্রকৃতি, প্রাণ ও আত্মাকে সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাঁহারাও এই বংশানুক্রমিক মতবাদ সমর্থন করেন। তবে এই মতবাদকে সাধারণতঃ লোকে এভাবে গ্রহণ করে যে, কি শারীরিক কি মানসিক এই উভয় প্রকারের বিশেষ বিশেষ গুণ ও সংস্কারসমূহ পিতা হইতে পুত্রে সংক্রমিত হয়। অথবা বলা যাইতে পারে, প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জগতে এই বংশানুক্রমিকতা এমনই একটি বস্তু যাহার দ্বারা সমস্ত বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি বা সংস্কারগুলি পিতামাতাগণ হইতে তাঁহাদের সন্তানদের ভিতর সংক্রমিত হয়।

সমগ্র মানব-প্রকৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বর্তমান যুগে বহুলভাবে অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই বংশানুক্রমিক মতবাদ লইয়া যেরূপ আলোচনা চলিতেছে, ঠিক একই ভাবে সকল যুগে সকল সময়ে সেরূপ আলোচনা হইত। প্রাচ্যদেশের প্রাচীন চিন্তাশীলগণ, খৃষ্ট-পূর্বাব্দে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এবং গ্রীসিয় দার্শনিক ও মনীষীগণ যদিও এই মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন না

তথাপি ইহা সত্য যে, মহাত্মা ডারুইন সমস্ত প্রাণী ও মানবজাতির ক্রমবিকাশতত্ত্ব আবিস্কার করিবার পর এই বংশানুক্রমিক মতবাদ নূতন রূপে আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভ্রূণতত্ত্ব ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে অপরাপর তত্ত্বসমূহ আবিষ্কৃত হইবার সংগে সংগে এই বংশানুক্রমিকতার রহস্য আরও সুস্পষ্ট ও সহজ হইয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানের আলোকে এই তত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায়, কি পশু বা কি মনুষ্য জগতে সর্বত্রই শিশুসন্তানগণ যে তাহাদের পিতামাতাদের অনুরূপ হইবে এমন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই, বরং সন্তানেরা পিতামাতাগণের বিশেষ বিশেষ গুণ, প্রকৃতি ও জীবন উত্তরাধিকারসূত্রে কিরূপে লাভ করে তাহার সমস্যা এত জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার মীমাংসা করা যেন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া আমাদের মন বা অন্তঃকরণের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া মনীষী আর্ণেষ্ট হেকেল্ যে বলিয়াছেন তাহা বংশ-পরম্পরা সাধারণ ব্যক্তি ও প্রাণীবিশেষের অতিবৃদ্ধি অথবা সাধারণ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতার বা পারম্পর্যের ফলস্বরূপ সে কথাতেও আমরা ঠিক সন্তুষ্ট হইতে পারি না, কারণ বংশানুক্রমিকতা বা বংশপারম্পর্য অনুসারে কিভাবে পিতামাতাদের প্রকৃতি সন্তানদের মধ্যে সংক্রমিত হয় এ রহস্য আমরা জানিতে চাই। যেমন কিরূপে সামান্য একটি অণুকোষ (cell) হইতে শিশুসন্তানদের সমগ্র শরীর, মন, প্রকৃতি এবং সংগে

সংগে তাহাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি গড়িয়া ওঠে সে সম্বন্ধে জানিবার জন্য আমাদের মনে সর্বদা প্রশ্ন উত্থিত হয়। তাহা ছাড়া যে সকল অসংখ্য অণুকোষ হইতে সন্তানদের শরীর গঠিত হয় তাহাদের বিষয় জানিতে আমরা সত্যই ইচ্ছুক। কারণ ইহাও আমরা লক্ষ্য করি যে, কি দৈহিক কি মানসিক সকল রকম বৈশিষ্ট্যকে নূতনভাবে উৎপন্ন করিবার শক্তি নবজাত শিশুদের আছে, আর সেজন্য বলিতে হয়—এসব রহস্য সত্যই দুর্জ্ঞেয়। আমাদের বৈজ্ঞানিক অথবা অনুসন্ধিৎসু মন যত-কিছু সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে এ রহস্য তাহাদের মধ্যে অধিকতর জটিল।

বংশপরম্পরাক্রমে গুণ, প্রকৃতি বা সংস্কার পিতামাতা হইতে সন্তানে যে সংক্রমিত হয় এই নীতি সম্বন্ধে মোটামুটি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা যাইতে পারে। যেমন, কিভাবে একটিমাত্র অণুকোষের ভিতর পিতামাতার শারীরিক গঠনের যাবতীয় বংশানুক্রমিক প্রবণতা, তাহাদের প্রকৃতি, মন ও আত্মা নিহিত থাকে তাহা জানিবার বিষয়। মানুষ বা প্রাণীদের শরীরের প্রত্যেকটি অংশ জন্মগ্রহণের পরও নূতনভাবে পুনরায় গঠিত হয়—ডারুইনের এই মতবাদকে (theory of panganesis)[২০] গ্রীক দার্শনিক

২০। 'কোন অংগের প্রত্যেক অবিভাজ্য অংশ পুনরুৎপন্ন হয়'—ডারুইনের এই আপাতত যুক্তি বা কল্পনার অর্থ এই যে, শরীরের সমস্ত অণুকোষ হইতে অতিসূক্ষ্ম আকারের কণা বা পরমাণুসমূহ ক্রমাগত বাহির হইয়া যাইতেছে।

ডেমোক্রিটাস [২১] প্রবর্তিত মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি বলা যায়। প্রকৃত কথা বলিতে কি, ডারুইনের মতবাদের দ্বারা বংশানুক্রমিক নিয়ম বা ধারার কোন সমস্যাই সমাধান করা হয় নাই। বরং অধ্যাপক গল্‌টন, রথ, আগাষ্ট ওয়াইজম্যান ও অন্যান্য মনীবীগণ ডারুইনের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষভাবে পরীক্ষা ও অনুশীলন করিয়া সাধারণভাবে গৃহীত বংশানুক্রমিক নিয়মনীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেনঃ 'অর্জিত প্রকৃতি বা স্বভাব' ('acquired characters') একজন হইতে অন্যে কখনও সংক্রমিত হয় না। পিতামাতাগণ ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করিয়া নির্দিষ্ট কোন স্বভাব বা প্রকৃতি অর্জন করিতে পারেন সত্য, কিন্তু সেই অর্জিত স্বভাব বা প্রকৃতিকে তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে কখনও আবার সংক্রমিত

এই সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি পুনরুৎপত্তিশীল অণুকোষসমূহে সঞ্চিত হয়। সুতরাং যতদিন প্রাণী অথবা প্রাণীর শরীর বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন কোনও পরিবর্তন পুনরুৎপাদক অণুকোষগুলিতেও সংক্রমিত হয়।' —ডারুইন প্রণীত 'গৃহপালিত অবস্থায় জীবজন্তু ও বৃক্ষের পরিবর্তন' (*The Variation of Animals and Plants under Domestication*), ২য় ভাগ, পৃ' ৩৪৯-৩৯৯

২১। মনীষী ডেমোক্রিটাসের অভিমতে কি পুরুষ কি নারী তাহাদের মিলনের সময় উভয়ের শরীরের প্রত্যেক অংগ হইতে তেজ নির্গত হইয়া দৈহিক শক্তি দ্বারা পুষ্ট হয়; অর্থাৎ শরীরের সমস্ত অংগ হইতে ক্ষরিত শুক্র সেই সেই অংগ যেন পুনরুৎপাদন করে।

করিতে পারেন না। মনীষী আগাষ্ট ওয়াইজম্যান বলেনঃ 'কোন প্রাণীর এরূপ অর্জন করিবার প্রবৃত্তি না থাকিলে কিছুতে সে নূতন কোন জিনিষ সঞ্চয় করিতে পারে না।[২২]

আপনারা অনেকেই বোধ হয় মনীষী ওয়াইজম্যান প্রবর্তিত জীবাণুর ক্রম-সংসরণবাদ সম্বন্ধে জানেন। পিতামাতা হইতে প্রত্যেকটি জিনিষই যে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাই, অথবা বংশপরম্পরা-ক্রমে পিতামাতার প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি প্রথমত শিশু-সন্তানদের ভেতর হয়তো প্রবল হইল, দ্বিতীয়ত, পিতামহের প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তৃতীয়ত, মাতামহীর, চতুর্থত, প্রপিতামহ বা বৃদ্ধপ্রমাতামহের প্রকৃতি হয়তো প্রধান বা প্রবল হইল—এই ধরণের প্রাচীন মতবাদ মনীষী ওয়াইজম্যান মোটেই স্বীকার করেন না। তিনি বরং 'জীবাণু' নামক একটি পদার্থ স্বীকার করিয়া এই ধরণের সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। মনীষী ওয়াইজম্যান বলেনঃ যখনি নির্দিষ্ট রাসায়নিক ও সর্বোপরি আণবিক গঠনের সহিত একরকম পদার্থ কোন একটি বংশ (generation) অন্য বংশে সংক্রমিত হয় তখনই বংশানুক্রমিকতার ধারার ঠিক ঠিক উৎপত্তি হয়।' তিনি এই পদার্থটির নাম দিয়াছেন 'জীবাণু' বা 'প্রাণপঙ্ক'।

২২। ওয়াইজম্যান প্রণীত 'বংশানুক্রমিকতা' (*Heredity*) ১ম ভাগ, পৃ' ১৭১

ডাঃ ওয়াইজম্যান বিশ্বাস করেন ঃ কোন একটি প্রাণীর মধ্যে যে সকল প্রবৃত্তি বিকাশ লাভ করে তাহার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ঐ জীবাণুর মধ্যে নিহিত থাকে। তাঁহার মতে ঐ জীবাণু বা প্রাণপঙ্কের অণুগুলি (protoplasmic molecules) ভিতরে বিকশিত ও বর্ধিত হয়, অর্থাৎ খাদ্য-পরিপাককরণ ও বিভাগের দ্বারা পরিবর্ধিত হইবার শক্তি অণুগুলির ভিতর সঞ্চিত থাকে। জীবাণুসমূহ একটি বংশ (generation) হইতে অন্য বংশে ক্রমশঃ সংক্রমিত হয়। কেননা তিনি বলেন ঃ 'ঐ জীবাণুসকলের ভিতর সামান রকমের আণবিক গঠন থাকে বলিয়া নির্দিষ্ট কোন একটি বিকাশের অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া তাহারা ঠিক একই স্তরের ভিতর দিয়া অতিক্রম করে ; তাহারা একটি বংশ হইতে অন্য বংশে সংক্রমিত হয় এবং পরিশেষে পরিণতিও তাহার ঠিক একই রকমের হইয়া থাকে। সেজন্য যে পদার্থটি প্রাণীদের মধ্যে তাহার স্বভাবের নিয়ামকরূপে থাকে তাহাকেই আমি 'জীবাণু' বলিয়াছি। আমার অভিমতে জীবাণুগুলির গঠন সত্যই বিচিত্র ও জটিল, আর সেজন্য অন্যান্য বিচিত্র ও জটিল প্রাণীদের প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও ইহাদের আছে।'[২২] ইহা ছাড়া তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ 'সুতরাং একথা স্বীকার করিতে হইবে যে,

২২। ওয়াইজম্যান প্রণীত "বংশানুক্রমিকতা (*Heredity*), ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭০

একটি বংশ (generation) হইতে অন্য বংশের মধ্যে বীজাণুর পূর্বানুবৃত্তি বা ধারাবাহিকতার ভাব অবশ্যই আছে। কোন কোন প্রাণী নিজে নিজেই বুকে হাঁটিয়া চলে। মোটকথা যাহা হইতে মাঝে মাঝে চারাগাছগুলি উৎপন্ন হয় এমন গাছের মূলের সঙ্গে আপনার জীবাণুর একটি রূপক কল্পনা করিতে পারেন। চারাগাছ যে মাঝে মাঝে মূল হইতে উৎপন্ন হয় এ উদাহরণই প্রাণীদের বংশপরম্পরার, অর্থাৎ প্রাণীরা যে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে তাহার প্রমাণ। ইহা হইতেই বোঝা যায়, শিশু-সন্তানদের চরিত্র বা প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে অর্জিত বস্তু নয়, অথবা পিতামাতাগণের নিজেদের স্বভাব ও প্রবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে তাহাদের সন্তানগণের মধ্যে সংক্রমিত হয় না। কারণ জীবাণুসকল যদি প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর নূতনভাবে উৎপন্ন না হইয়া তাহাদের পূর্ববর্তী বংশ অথবা পিতামাতাগণের নিকট হইতে কেবল স্বভাব ও প্রবৃত্তিগুলি লাভ করিত তাহা হইলে একথা ঠিক যে, তাহাদের আকৃতি ও আণবিক গঠনপ্রণালী কখনই সেই সেই প্রাণিগণের অনুযায়ী হইত না বা তাহাদের উপরই কেবল নির্ভর করিয়া থাকিত না। কিন্তু যে উন্নত পরিবেশকে অবলম্বন করিয়া জীবাণুসমূহ উৎপন্ন হয় তাহা যেন প্রাণীগণ নিজেরাই গঠন করে বলিয়া মনে হয়, আর জীবাণুরা প্রথম হইতে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব হইতে তাহাদের স্বাভাবিক গঠন ও প্রকৃতি লইয়াই যেন জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু যে বংশানুক্রমিতার প্রকাশ-উন্মুখতা ও ধারা জীবাণুগুলির ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পরিপূর্ণভাবে

আণবিক গঠনের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সন্তানদের প্রকৃতি বা স্বভাবসমূহ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় একথাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শিশু-সন্তানদের যে স্বভাবগুলি জীবাণুর মধ্যে সুপ্তভাবে বীজের আকারে নিহিত ছিল কেবল সেগুলিই বংশপরম্পরা বা পুরুষানুক্রমে সংক্রমিত হইতে পারে। তবে একথাও আবার সত্য যে, যে সমস্ত স্বভাব বা প্রকৃতি পিতামাতাগণের জীবিত থাকার সময় বাহিরের পরিবেশ হইতে গৃহীত বা অর্জিত হইয়াছে যেগুলি আর সন্তানে সঞ্চারিত হয় না।'[২৩] পরিশেষে মনীষী ওয়াইজম্যান এই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন: 'কিন্তু সমস্ত ঘটনাতে আমরা এই নীতি দেখিতে পাই—কেবলমাত্র যে তথ্য বা ঘটনাগুলি দ্বারা সোজাসুজিভাবে অর্জিত স্বভাবের সংক্রমণনীতি প্রমাণিত হয় তাহাদের খণ্ডন করা হইয়াছে এবং একমাত্র যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এই যুক্তি এতদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে।'[২৪]

সুতরাং বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ অনুশীলনকারীরা কতটুকু পর্যন্ত বংশানুক্রমিক নীতির উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি। তাহার পর যে প্রাচীন ও সচরাচর খণ্ডিত যুক্তিগুলি প্রমাণ করিতে চায় যে, প্রত্যেক প্রাণীর

২৩। ওয়াইজম্যান প্রণীত 'বংশানুক্রমিকতা' (*Heredity*), ১ম ভাগ, পৃঃ ২৭৩

২৪। ঐ, পৃঃ ৪৬১

শরীর বারবার নূতন জীবাণুসমূহকে উৎপাদন করে এবং পিতামাতাগণ শক্তিগুলিকে অর্জন ও বিকাশ করিয়া তাহাদের সন্তানদের মধ্যে সেগুলিকে পুনরায় সঞ্চার করিয়া দেন একথা বিশ্বাস করার ইচ্ছাও আমাদের নাই, কেননা বর্তমানে আমরা জানিতে পারিয়াছি, যে সমস্ত জীবাণু অথবা জীবকোষ তাহাদের বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তি ও শক্তিগুলিকে বিকাশ সাধন করে, সৃষ্টির পূর্বেই সেই সকল শক্তি তাহাদের ভিতর বীজাকারে সুপ্ত ও নিহিতই থাকে, পিতামাতাগণ মাত্র ঐ প্রবৃত্তি ও শক্তিগুলির বিকাশের উপায় পথ বা অবলম্বন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আসল কথা এই যে, পিতামাতাগণ কখনও জীবাণু বা প্রাণপঙ্কের সৃষ্টি করিতে পারে না, জীবদেহের জন্ম বা উৎপত্তির পূর্বেও তাহাদের অস্তিত্ব ছিল বা থাকে।

কিন্তু এই জীবাণুগুলির স্বরূপ কি? কোথা হইতে তাহারা তাহাদের প্রবৃত্তি বা প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রহণ করে? অবশ্য ইহার উত্তর দান করা বিশেষ সহজ নয়। ডাঃ ওয়াইজম্যান ও তাঁহার মতানুবর্তিগণ বলেন: বীজাণুরা তাহাদের নিজেদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণ একটি সঞ্চয়-কেন্দ্র হইতে গ্রহণ করে অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই সাধারণ সঞ্চয়-কেন্দ্রটি যে কি ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন না, অথবা কোথায়ই বা সেই সাধারণ সঞ্চয়-কেন্দ্রটি থাকে এবং কেনই বা এক শ্রেণীর জীবাণুরা নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রবৃত্তির বিকাশ করে ও অন্য জীবাণুরা অপর বৈশিষ্ট্যগুলি পরিত্যাগ না করিয়া বরং সঞ্চয়ই করে,

আর কেইবা সেই জীবাণুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে—এ সকল প্রশ্নের মীমাংসাও সন্তোষজনকভাবে তাঁহারা করিতে পারেন না। তবে ডাঃ ওয়াইজম্যানের বক্তব্য যতটুকু আমরা বুঝিয়াছি তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, পিতামাতাগণ জীবাণু বা প্রাণবীজ-গুলিকে সৃষ্টি করিতে পারেন না, জীবাণুগুলি তাহাদের শরীরের জন্ম ও বৃদ্ধির পূর্বেও থাকে, অর্থাৎ পূর্ব-পূর্ব জন্মে অথবা বিশ্বের সাধারণ সঞ্চয়-কেন্দ্ররূপ বিরাট প্রকৃতিগর্ভে তাহারা পূর্ব হইতে নিহিত থাকে। যদি বলা যায় পূর্বজন্ম অথবা বংশপারম্পর্য নষ্ট ও লুপ্ত হইয়া গেলে তাহারা কোথায় যায়? তাহার উত্তরে বলিব যে তাহারা পৃথিবীতে অর্থাৎ বিশ্বের বিরাট শরীরেই অন্য আকারে মিশিয়া থাকে, কখনও নষ্ট হয় না।

প্রকৃতপক্ষে এই যে অপরিণত ও সচরাচর খণ্ডিত অথবা অপ্রমাণিত ধারণা: জীবাণুদের জন্মের সময়েই ঈশ্বর তাহাদের নূতন করিয়া সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের ভিতর পিতামাতাগণের শক্তি ও বৈশিষ্ট্যগুলির মাত্র বিকাশ সাধন করেন—এই ধরণের বিশ্বাস আর আমরা পোষণ করিতে পারি না। কেননা এই ধারণা ও যুক্তি গ্রহণ করিলে ঈশ্বরকে অবিচারী ও একদেশদর্শী বলিয়া প্রমাণ করা হয়, সুতরাং ইহাকে কখনই আমরা গ্রহণ করিতে পারি না, আমরা ইহা অপেক্ষা আরও উন্নত ও ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা ও যুক্তি গ্রহণ করিতে চাই। খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ ও অন্যান্য ধর্মমতাবলম্বীরা যে একজন্ম-বাদ (one-birth theory) সমর্থন ও প্রচার করেন, তাহার দ্বারাও কিন্তু কোন সমস্যার সমাধান আজ পর্য্যন্ত হয় নাই; কেননা মানুষ বা প্রাণীদের ভিতর কেন যে এত বৈষম্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়

তাহার কারণ তাঁহারা নির্দেশ করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া সকল রকম প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য পিতামাতাগণের নিকট হইতে আমরা গ্রহণ করি কি-না অথবা অর্জিত প্রকৃতি আসলে সন্তানদের মধ্যে সংক্রমিত হয় কি-না এসব প্রশ্নের উত্তরও ভালভাবে তাঁহারা দিতে পারেন না। সুতরাং ইহা সত্য যে, খৃষ্টান ও ইহুদীদের এক-জন্মবাদের স্বপক্ষে যুক্তিদ্বারা এ সকল প্রশ্নের কোনটিরই মীমাংসা করা যায় না ; পরন্তু 'জীবাণুর ক্রমসংসরণবাদ' বা জীবাণুরা ধারাবাহিকভাবে সঞ্চারিত হয় এই যুক্তি (continuity of germ-plasm) বংশপরম্পরা নীতি বা বংশক্রমিকতাকে (heredity) জন্মান্তরবাদের সমানভাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তবে যতদিন না জীবাণুগণের সাধারণ সঞ্চয়-কেন্দ্রটি কেন ও কিভাবে সকল রকম বৈশিষ্টা ও প্রকৃতি সঞ্চয় করিয়া রাখে ইহার সমস্যা বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে যথাযথভাবে না প্রমাণ করিতে পারিতেছে ততদিন ঐ সকল যুক্তি ও মতবাদকে ঠিক সম্পূর্ণ বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না।

তবে বেদান্তদর্শন ঐ প্রাণবীজ, জীবাণু অথবা জীবকোষে নিহিত অব্যক্ত শক্তিগুলির যথাযথ কারণ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া বেদান্ত বলিয়াছে : ঐ জীবাণু বা জীবকোষের প্রত্যেকটিই পুনর্জন্মগ্রহণকারী প্রাণীদেরই সূক্ষ্ম রূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়, আর পূর্ব-পূর্ব জীবনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও বাসনাসমূহ সূক্ষ্মরূপে প্রাণীদেরমধ্যেই সুপ্ত আকারে থাকে। শরীরের জন্মের বহুপূর্ব হইতে ঐ সংস্কারসমন্বিত জীবাণু বা

প্রাণবীজগুলি জীবিত ছিল, শরীরের মৃত্যুর পরও উহারা বাঁচিয়া থাকিবে—কোনদিনই তাহাদের ধ্বংস হইবে না। এই প্রাণ-বীজগুলিকেই 'সূক্ষ্মদেহ' বলিতে পারি। থিয়োসফিষ্টদের মতে সূক্ষ্মদেহ বাষ্প বা বায়বীয় শরীর-বিশেষ, তত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে ছায়ামূর্তি (double) অথবা প্রেততত্ত্বানুশীলনকারীদের মতে অশরীরি আত্মা। কিন্তু আসলে এই সূক্ষ্মদেহ ইহাদের কোনটিই নয়। সূক্ষ্মশরীরকে দৈহিক, মানসিক ও ঐন্দ্রিয়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম-ক্রিয়াশক্তির একটি বায়বীয় কেন্দ্র বলা যায়। এই কেন্দ্রটীতে প্রাণীদের সকল প্রকারের শক্তি বিকশিত হইবার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। এই কেন্দ্র হইতেই শক্তিগুলি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়। এই সূক্ষ্মশরীরেই প্রাণীদেহের অতিসূক্ষ্ম পদার্থকণা অথবা বায়বীয় উপাদানগুলি এবং যে প্রাণসত্তা বা জীবনীশক্তির জন্য আমরা বাঁচিয়া থাকি ও কর্ম করি সে সমস্তই নিহিত থাকে। তাহা ছাড়া, আমরা যেমন দেখি যে, বীজের মধ্যে বৃক্ষের ফুল ও ফলের বৃদ্ধি, পরিণত ও উৎপন্ন হইবার সকল রকম শক্তিই সূক্ষ্ম আকারে থাকে, আমাদের সূক্ষ্ম মানসিক ও ঐন্দ্রিয়িক শক্তিগুলিও সেরূপ এই সূক্ষ্মদেহে অব্যক্ত বা বীজাকারে সঞ্চিত থাকে।

মৃত্যুর সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার সকল শক্তিকে একটি কেন্দ্রে একত্রিত করিয়া প্রাণবীজে বা সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান করে। এজন্য বেদান্ত বলে ঃ শিশু-সন্তানদের চরিত্র বা প্রকৃতি গঠনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা অথবা পিতামাতার ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছুমাত্র দায়ী নয়, বরং প্রত্যেক শিশু-সন্তানই তাহার প্রবৃত্তি,

শক্তি-সামর্থ্য ও চরিত্রের বিকাশ ও গঠনের জন্য নিজে নিজে দায়ী। যেমন কোন শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পর যদি ভবিষ্যতে ঘাতক অথবা সাধু, ধার্মিক অথবা অধার্মিক হয় তাহার কারণ একমাত্র তাহার নিজের 'কর্ম' বা প্রাক্তন। প্রত্যেক ব্যক্তির সূক্ষ্ম-শরীরে সঞ্চিত সুপ্ত সংস্কারই তাহার চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে।[২৫]

তাহা হইলেও একথা প্রশ্ন করিলে অন্যায় হইবে না যে, জগতে এত বৈষম্য ও বৈচিত্র্যই বা দেখা যায় কেন? ইহার সঠিক উত্তর পাওয়াও কঠিন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাণবীজ মাতা-পিতা হইতে সন্তানে সংক্রমিত হয়—এই মতবাদ যাহারা বিশ্বাস করে তাহারাও ইহার সমস্যা সমাধান করিতে পারে না। কিজন্য একই পিতামাতার পুত্রগণের পরস্পারের ভিতর মিল বা অমিল, সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, কেনই বা একই পিতামাতার একই সময়ে যমজ দুইটি শিশুসন্তান জন্মগ্রহণ ও সমান পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে লালিত-পালিত হইলেও গঠনে, প্রকৃতিতে ও চরিত্রে তাহাদের পার্থক্য দেখা যায় এবং কেনই বা বেশীর ভাগ সময়ে উভয়ের গুণ বিপরীত ভাবাপন্ন হয়—বংশানুক্রমিকতারূপ নিয়ম ও যুক্তি

২৫। সূক্ষ্মদেহের অবচেতন স্তরে জন্ম-জন্মসঞ্চিত অসংখ্য সংস্কার বীজাকারে সুপ্ত থাকে। মানুষের চরিত্র—যাহা বাহিরে কার্যের আকারে প্রকাশিত হয় তাহা ঐ সুপ্ত সংস্কাররূপ বীজ হইতে গঠিত হয়। সূক্ষ্ম-সংস্কারই মানুষের সকল-কিছুর নিয়ামক ও স্রষ্টা।

এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কোনই সদুত্তর দিতে পারে না। মনে করুন কোন একটি লোকের পাঁচটি শিশুসন্তান আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমটি হয়তো সাধু ও সচ্চরিত্র হইল, দ্বিতীয়টি নির্বোধ, তৃতীয়টি নরঘাতক, চতুর্থটি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিভাবান্ এবং পঞ্চমটি বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন হইল। এখন জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাহাদের মধ্যে এত রকম বৈষম্য কে আনিয়া দিল? তাহাদের এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা একেবারে আকস্মিক নয়, কেননা আকস্মিক অথবা সম্পূর্ণ আগন্তুক বলিয়া কোন-কিছু বস্তুই পৃথিবীতে নাই? জগতের যাবতীয় কার্য বা ঘটনাই কার্য-কারণ-সূত্ররূপ নিয়মের অধীন। কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না, কার্য ব্যতীতও সেরূপ কোন কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ পাঁচটি শিশু-সন্তানের ভিতর যে বৈষম্য বা পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহার একটি কারণ অবশ্যই আছে; তাহা না হইলে কে-ই বা একটি শিশুকে সাধু ও সচ্চরিত্র এবং অপর শিশুটিকে নির্বোধ-রূপে সৃষ্টি করিল? পিতামাতা কি শিশু-সন্তানদের ঐ বৈষম্যের জন্য দায়ী? না, পিতামাতাই বা কেন সন্তানদের জন্য দায়ী হইবেন? মাতাপিতা কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না যে, তাঁহাদের পুত্রগণ নরঘাতক, দুর্বৃত্ত অথবা নির্বোধ হইয়া জন্মগ্রহণ করুক। সকল পিতামাতাই অন্তরের সহিত কামনা করেন যেন তাঁহাদের সন্তানগণ সর্বাপেক্ষা সদ্গুণশালী ও সুখী হয়। কিন্তু এরূপ কামনা করা সত্ত্বেও তাঁহাদের সন্তানদের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব বা প্রকৃতির বিকাশ হয়। সুতরাং ইহার কারণই বা কি? বংশানুক্রমিকতারূপ নীতি বা মতবাদ কি ইহার সঠিক

উত্তর দিতে পারিবে? না, আমাদের মনে হয়, ইহার সদুত্তর এই মতবাদ হইতেও পাওয়া যাইবে।

আবার মনে করুন, কোন একটি লোকের বয়স চব্বিশ বৎসর। তাহার কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে, যেমন সঙ্গীত অথবা চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি শিল্পের প্রতিভা তাহার আছে। কিন্তু সেই সকল সদ্‌গুণ থাকিলেও সে তাহার পিতামহের ন্যায় বক্র নাসিকা এবং টেরা চক্ষু এবং আরও কতকগুলি অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য লাভ করিল। মনে করুন যুবকটি জন্মিবার পূর্বেই তাহার পিতামহও মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এক্ষণে যাঁহারা বংশানুক্রমিকতারূপ নীতি ও যুক্তি বিশ্বাস করেন তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন: যুবকটি তাহার শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার পিতামহের নিকট হইতে পাইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কখন সে যুবকটি ঐ সমস্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্য তাহার পিতামহের নিকট হইতে গ্রহণ করিল, তাহার পিতামহ তো তাহার জন্মিবার ছয় বৎসর পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন? সুতরাং গুণগুলি গ্রহণ বা অর্জন করিবার সময়ই বা সে পাইল কখন এবং কোথা হইতে? উত্তরে হয়তো তাঁহারা বলিবেন: হ্যাঁ, পিতামহের নিকট হইতেই যুবকটি তাহার শারীরিক বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলি স্থূল অবস্থায় নয়—সূক্ষ্ম জীবাণু অবস্থায় থাকিবার সময়ে পাইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, তাহা হইলে ঐ সূক্ষ্ম জীবাণুটির স্বরূপ কি? প্রকৃতপক্ষে ঐ জীবাণু একটি অতিসূক্ষ্ম প্রাণপঙ্ক (protoplasum)—গাঢ় ও চটচটে আটার ন্যায় পদার্থ বিশেষ। অত্যন্ত শক্তিমান দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে

মানুষের প্রাণপঙ্কের সহিত কুকুর, বিড়াল ও এমন কি গাছের প্রাণপঙ্কের মধ্যে সামান্যই পার্থক্য দেখা যায়। মোটকথা এই প্রাণপঙ্ক অথবা প্রাণবীজ দেখিতে একটি আলপিনের অগ্রভাগে যতটুকু জায়গা থাকে ঠিক ততটকু। এক্ষনে, ঐ পূর্বোক্ত যুবকটি যদি বিশেষ বিশেষ গুণগুলি তাহার পিতামহের নিকট হইতে পাইয়া থাকে তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, যুবক যখন সূক্ষ্ম জীবাণু বা প্রাণপঙ্ক আকারে ছিল তখনই ঐ সকল গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে সে পাইয়াছে? অর্থাৎ স্বীকার করিতে হইবে যে, যুবকটির নাসিকা উৎপন্ন হইবার পূর্বে তাহার পিতামহের নিকট হইতে সে বক্রনাসিকা পাইয়াছে? তাহার চক্ষু এবং মস্তিষ্কও উৎপন্ন হইবার পূর্বে সে তাহার টেরা চক্ষু, সঙ্গীত ও শিল্প প্রভৃতি বিদ্যার প্রতিভা পিতামহের নিকট হইতে লাভ করিয়াছে? কিন্তু সত্য বলিতে কি ইহা কি সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না? মনে করুন, ঐ বংশানুক্রমিকতা যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই তাহা হইলে এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে যথার্থভাবে আমরা কি বুঝিব? তাহার দ্বারা এ কথাই আমরা বুঝিব যে, জন্মগ্রহণের পূর্বে যুবকটির সকল রকম গুণ ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য তাহার পিতামহের নিকট হইতে সংক্রমিত হইয়া সূক্ষ্ম প্রাণপঙ্কের আকারে তাহারই ভিতর নিহিত ছিল। তাহার টেরা চক্ষু, বক্র নাসিকা ও সংগীত-শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিভা পূর্ব হইতেই বীজরূপ প্রাণপঙ্কের আকারে আপনাতে সুপ্ত ছিল। সুতরাং এই বংশানুক্রমিকতারূপ নীতি ও যুক্তি পুনর্জন্মবাদরূপ সিদ্ধান্তের অনুরূপ বলিয়া মনে করা যায়।

মোটকথা সন্তানদের ভিতর স্বভাব, গুণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পৃথক পৃথক কেন হয়, অথবা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও প্রতিভা প্রভৃতির বিকাশের বেলায় কেন কম বেশী হয়, এ সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র পুনর্জন্মবাদই করিতে পারে। বংশ-পারম্পর্যরূপ নীতি বা যুক্তি বর্তমানে অকেজো হইয়াছে বলিতে হয়। বার বৎসরের বালক প্যাস্কাল (Pascal) জ্যামিতির দুরূহ অংশগুলির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছিল। পাঁচ বৎসর বয়স্ক মেষপালক ম্যান্‌জিয়ামেলো কলের ন্যায় অনায়াসে কঠিন অঙ্কসমূহ কষিতে পারিত। অথবা বালক জেরা কোল্‌বার্ণের সম্বন্ধেও বলা যায়। জেরা কোল্‌বার্ণের বয়স যখন আট বৎসর মাত্র, তখন সে কোনরূপ অক্ষর ব্যবহার না করিয়াই তড়িতের ন্যায় কঠিন কঠিন অঙ্কসমূহের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিত। যেমন উদাহরণরূপে বলা যায়ঃ "একবার ঐ বালক আট সংখ্যাটিকে ষোলগুণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পনেরটি সংখ্যায় তাহার উত্তর বলিয়া দিল। সংখ্যাটি হইল ২৮১, ৪৭৪, ৯৭৬, ৭১০, ৬৫৬।" তাহার সংখ্যাগুলিও নির্ভুল হইয়াছিল। পরে যখন ঐ দীর্ঘ সংখ্যাটির বর্গমূল (Square root) কত হইবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তখনও সে মুহূর্তের মধ্যেই তাহার সঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার পর ঐ সংখ্যাটির ঘনমূল (Cube root) সম্বন্ধেও যখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তখন সে ক্ষণিকের মধ্যে একশত লক্ষ সংখ্যায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল। কোনও একজন ব্যক্তি বালকটিকে একবার অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেনঃ "আচ্ছা, বল দেখি, আটচল্লিশ বৎসরে কতগুলি

মিনিটের সংখ্যা হয় ?" বালকটি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছিল ঃ ২৫,২৮৮,৮০০ মিনিট।

বিখ্যাত পাশ্চাত্য সংগীতবিৎ মোজার্ত চারি বৎসর বয়সে যন্ত্রসংগীতের একটি গৎ ও আট বৎসর বয়সে একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। থেরেসা মিলানোল্লা অল্প বয়সে এমনি কৃতিত্বের সঙ্গে বেহালা বাজাইয়াছিল যে, সকলে শুনিয়া ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিল থেরেসা নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে তাহা শিক্ষা করিয়াছিল। অত্যন্ত শিশু বা অল্প বয়সে বহু বালক-বালিকা শিল্প ও চিত্র-বিদ্যায় আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিয়াছে এরূপ উদাহরণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বেদান্তদর্শনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার শংকরাচার্য বার বৎসর বয়সের সময় তাঁহার ভাষ্য-রচনা শেষ করেন। সুতরাং এখানে এক বংশ হইতে অন্য বংশে শক্তিসমূহ সঞ্চারিত হয় এই মতবাদের দ্বারা কিরূপে এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় ? আপনারা অনেকেই বোধ হয় অন্ধ-গায়ক টমের আশ্চর্য সংগীত-প্রতিভার কথা শুনিয়া থাকিবেন। এই অন্ধ নিগ্রো দাস টম তাহার মনিবের চা বাগানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং খাঁটি নিগ্রোদের মতোই দরিদ্র অবস্থাতে লালিত-পালিত হইয়াছিল। সংগীত বা অপর কোন বিদ্যায় সে কোনদিনই শিক্ষালাভ করে নাই। অথচ একদিন মনিব-পরিবারের সকলে যখন নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিল তখন সে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া তাহার মনিবের পিয়ানো যন্ত্রটি জীবনে সেই সর্বপ্রথম এমনি সুন্দরভাবে বাজাইয়াছিল যে, তাহাতে তাহার অসাধারণসংগীত-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। পরে সে আমেরিকায় ভিন্ন

ভিন্ন প্রদেশে গিয়াও তাহার অদ্ভুত সংগীত বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিল। অথচ তাহার শারীরিক গঠন ও প্রকৃতি ছিল খাঁটি নিগ্রোজাতিরই মতো। বুদ্ধিও তাহার বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল না, কিন্তু সংগীতবিদ্যায় সে বিশেষ পারদর্শী ছিল। সংগীতে তাহার এমনি প্রতিভা ছিল যে, গৎ ও স্বরলিপি সে নিজেই রচনা করিতে পারিত এবং নিজের রচিত গৎই তিনি সর্বত্র বাজাইত। কখনও কখনও দ্রুত একটি নূতন গৎ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা হুবহু নকল করিয়া সে বাজাইতে পারিত। এখানে ঐ শক্তি সে কোথা হইতে পাইল? কাহার নিকট হইতেই বা টম সে শক্তি অর্জন করিল? তাহার মাতাপিতাও সম্ভবতঃ বেহালা-বাদ্য কখনও শুনিবার সুযোগ পায় নাই। টমও জীবনে কখনও পিয়ানো-বাদ্য শিক্ষা করে নাই, অথবা তাহার সে শক্তি যে আছে সেকথাও সে নিজে কখনও পূর্বে জানিত না। ঠিক এই ধরণের আর একটি ঘটনার কথা আমি জানি। একটি ছয় বৎসর বয়সের বালিকাকেও আমি দেখিয়াছি। সে অতি সুন্দররূপে ও আশ্চর্য ভাবে পিয়ানোযন্ত্র বাজাইতে পারিত এবং যে কোন গৎ একবার মাত্র শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহা হুবহু বাজাইতে পারিত। আমার মনে হয় সে পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই পিয়ানোবাদ্য ভাল করিয়া বাজাইতে পারিত। মোটকথা এ ধরণের উদাহরণ পূর্বজন্ম বা জন্মান্তর যে আছে তাহা উৎকৃষ্টরূপে প্রমাণ করে।

কিন্তু বংশপারম্পর্যরূপ মতবাদই কি সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে? না, এই সকল উদাহরণ 'ক্রমবর্ধমান বংশনীতি'কে ঠিক সমর্থন করে না। 'ক্রমবর্ধমান' (cumulative) অর্থে

'ধারাবাহিকতা'। এই নীতি বা মতবাদ যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদের মতে ক্রমবর্ধমান বা ধারাবাহিক বংশ-প্রসারণের নীতি অনুযায়ী প্রতিভাবান কোন এক ব্যক্তি সমাজে জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ ক্রমোন্নত স্তর অতিক্রম করিয়া মানুষ কম প্রতিভা হইতে ধীরে ধীরে বেশী প্রতিভার অধিকারী হয় এবং এইরূপে চলিতে চলিতে পরিশেষে সে যথার্থ প্রতিভার অধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিভাবান লোকদের বংশধারার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে বংশে হোমার, প্লেটো, সেক্ষপীয়ার, গেটে, রাফেল প্রভৃতি মনীষীরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই সেই বংশে প্লেটো, সেক্ষপীয়ার অথবা গেটের মতো প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আর ছিল না। কিন্তু ঐ সমস্ত মনীষীদের বংশে পূর্বতন পুরুষদের মধ্যে এমন কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন আর কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা হইতেও প্রমাণ করা যায় যে, পুনর্জন্মবাদ ব্যতীত আর কোন নীতি বা যুক্তির দ্বারা ঐ সকল প্রতিভাবান মনীষীদের জন্ম-রহস্যের কোন সমাধানই করা যায় না।

যাহারা পুনর্জন্মবাদকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাহারা সন্তানদের মধ্যে উপযুক্ত প্রতিভা বা অসাধারণ কোন শক্তি না থাকার জন্য মাতাপিতাদের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে চাহে না, বরং তাহারা নিজেদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে এবং চিন্তা করে যে, বর্তমানে তাহারা যে ভাব ও অবস্থার মধ্যে রহিয়াছে ইহা তাহাদের পূর্ব-পূর্ব জন্মেরই কৃত চিন্তা ও কর্মের ফল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ তাহারা এই কথার অর্থ

ভাল করিয়া বুঝে যে, 'যে যেমন কর্ম করিবে, ফল তাহার সেরূপই হইবে', আর সেজন্য তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে তাহারা বর্তমান সুচিন্তা ও সুকর্মের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। তাহা ছাড়া চরিত্রের কর্মবাদ বা কার্য-কারণ নিয়মের দ্বারাই জীবনের যতপ্রকার বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া থাকে। এই কর্মবাদ বা কার্য-কারণ-নীতিই পুনর্জন্মবাদ ও নিম্নতর হইতে উচ্চতর ভূমিতে উন্নয়ন ও সঞ্চরণশীল প্রাণবীজ বা জীবাণুদের ক্রমবিকাশের প্রণালী সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমবিকাশ ও পুনর্জন্মবাদ

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার প্রতিদিনই আমাদের জ্ঞান ও আবিস্কারের দ্বার যেন উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে ; আমরাও বিশ্বের চরমসত্যরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের দিকে ক্রমশঃ যেন অগ্রসর হইতেছি। শুধু তাহাই নহে, বিজ্ঞান যে জ্ঞানের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে তাহার জ্যোতির্ময় আলোকে কুসংস্কারগুলিকে পবিত্র করিয়া তুলে এবং যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসুর জ্ঞানের পথে যাহা কিছু অন্তরায়রূপে প্রতিভাত হয় সেই চিরাচরিত আচার-বিচার ও অন্ধবিশ্বাসসমূহকে তাহা ভস্মীভূত করিয়া দেয়। বিজ্ঞান মানব-জাতির কি প্রকারের উপকার সাধন করিয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিলে প্রথমে দেখা যায় যে, অনৈসর্গিক দৈবশক্তির প্রভাবে শূন্য হইতে বিশ্বসংসার সৃষ্টি হইয়াছে এই ধরনের অযৌক্তিক মতবাদকে খণ্ডন করিয়া সে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে অকস্মাৎ এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয় নাই, বর্তমান পূর্ণ-বিকাশসম্পন্ন এই আকারে বা অবস্থায় উপনীত হইতে সে বহু ক্রমবিকাশের স্তর অতিক্রম করিয়াছে। এই ক্রমবিকাশের স্তরগুলির পরস্পরের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে, একটি অপরটির সঙ্গে কার্য-কারণ-সূত্রে আবদ্ধ। ইহারা নির্দিষ্ট একটি নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। বিজ্ঞানের মতে বিশ্ববৈচিত্র্য ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া

গড়িয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ আপেক্ষিক সম-অবস্থা বা সাম্য হইতে আপেক্ষিক বিভিন্নতাময় অবস্থা বা বৈষম্যের মধ্য দিয়া পৃথিবী ধারাবাহিক পরিবর্তনরূপ ক্রমিক বিকাশের পথে গঠিত হইয়াছে। বিরাট সৌরজগত হইতে আরম্ভ করিয়া অতিক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল জিনিষই প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের পথে সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের এই পৃথিবীরূপ গ্রহটিও একদিনে গড়িয়া উঠে নাই—ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহা বিকশিত হইয়াছে। এই পৃথিবী সৃষ্টি হইবার পূর্বে সম্ভবতঃ নীহারিকা-পিণ্ডের আকারে ছিল। নীহারিকার প্রাথমিক অবস্থা ঘনবাষ্পময়। সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র গ্রহ-উপগ্রহ সমস্তই বর্তমান আকারে পরিণতি লাভের পূর্বে অসংখ্য প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও বিকাশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ঠিক এই রকমভাবে উদ্ভিদ্, পতঙ্গ, মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, জন্তু-জানোয়ার, মানুষ ও পৃথিবীবাসী সমস্ত চেতন পদার্থ বর্তমান আকার ধারণ করিবার পূর্বে ক্ষুদ্র একটি জীবাণু (প্রাণবীজ) হইতে ক্রমবিকাশের ধারায় সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ক্রমবিকাশবাদ হইতে আমরা শিক্ষা করি যে, মনুষ্যজাতি পৃথিবীতে অকস্মাৎ সৃষ্ট হয় নাই; মনুষ্য হইয়া জন্মিবার পূর্বে পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে নিম্নশ্রেণীর জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদাদির সঙ্গেও তাহার সম্পর্ক ছিল। মোটকথা প্রাণবীজ বা জীবাণু মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে বহুপ্রকার শরীর ধারণ করিয়াছে। ভ্রূণতত্ত্ব হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য সমগ্র সৃষ্টির সার বা শ্রেষ্ঠ বস্তু। এই তত্ত্বের দ্বারা একথাও আমরা জানিতে পারি, জীবাণু মনুষ্য-শরীর ধারণ করিবার পূর্বে

ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীজগৎ বা বিশিষ্ট জীবপুঞ্জের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব, মৎস্য, সরীসৃপ, কুকুর, বানর ও পরিশেষে মানুষে আসিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রকৃতিকে যদি সাম্য-গুণযুক্ত বা সংগতিসম্পন্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়া আমরা স্বীকার করি তাহার নিয়মের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা বা বৈষম্য নাই, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যাহা আছে তাহা ক্ষুদ্র আকারে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেও আছে, তাহা হইলে প্রকৃতি বলিতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে অনুশীলন করিলে দেখিতে পাইব যে, পৃথিবীর সমস্ত জীবাণু মনুষ্য-শরীর ধারণ করিবার পূর্বে আরও অসংখ্য জন্মের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে।

অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশবাদের পরিচয় দিতে গিয়া বিজ্ঞান বলিয়াছে: এই প্রণালীর মধ্যে দুইটি প্রধান বিষয় আছে, প্রথমটি—কি উদ্ভিদ-জগৎ ও কি প্রাণী-জগৎ, সর্বত্রই প্রাণবান পদার্থের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি আছে, আর দ্বিতীয়টি—অনুকূলে বা প্রতিকূলে ঐ বৈষম্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার অনুযায়ী একটি পরিবেশের প্রবৃত্তি আছে! এই ধারার প্রথমটি না থাকিলে আবার কোন বিকাশই সম্ভব হইবে না। তবে প্রাণীদের ভিতর সুপ্তভাবে পার্থক্য হইবার প্রবৃত্তিটি নিহিত থাকে কেন—সে সম্বন্ধে বিজ্ঞান কিছু বলিতে পারে না। দ্বিতীয় বিষয় বা নিয়মটির উপর প্রাকৃতিক নির্বাচনী-নীতি নির্ভর করে। অবশ্য প্রাণীদের মধ্যে যে পার্থক্য হইবার প্রবৃত্তি থাকে তাহা জীবনরক্ষানুকূল বা বাঁচিয়া থাকিবার সহায়ক মতো অবস্থার সে সাহায্য গ্রহণ করে।

কাজেই জীবাণুরা বাঁচিবার জন্য হয় অনুকূল পরিবেশ বাছিয়া লয়, নয় পরিবেশ প্রতিকূল বা বিপরীত হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিল রাখিবার জন্য সে নিজের রূপও পরিবর্তন করে। আসলে জীবন-সংগ্রাম থাকার জন্য এই নির্বাচনপ্রণালী সম্ভবপর হয়। এবিষয়ে জীবন-সংগ্রাম একটি অপরিহার্য ব্যাপার। সুতরাং ক্রমবিকাশবাদ মূলতঃ তিনটি নিয়মের ওপর নির্ভর করেঃ (১) পৃথক হইবার প্রবৃত্তি, (২) প্রাকৃতিক নির্বাচন, (৩) জীবন-সংগ্রাম। এই তিনটি নিয়মের সাহায্যে বিজ্ঞানও মানুষের দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছে। আর একথাও সত্য যে, বিজ্ঞান যতদিন না প্রত্যেক অবস্থার প্রাণীদের মধ্যে সুপ্তভাবে নিহিত 'পৃথক হইবার প্রবৃত্তি'-টির কারণ নির্দেশ করিতে পারিতেছে ততদিন তাহা অপরিজ্ঞাতই থাকিবে।

মানুষের আত্মা বা সূক্ষ্মশরীর সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব, সূক্ষ্মশরীরে দুইটি প্রকৃতির সমাবেশ আছে; একটি জৈবিক বা পশুপ্রবৃত্তি ও অপরটি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি। পশুপ্রবৃত্তি বলিতে সাধারণ হিতাহিতজ্ঞানবর্জিত পশুদের স্বভাব বা প্রকৃতি। পশুপ্রবৃত্তিতে কেবলই শারীরিক ভোগ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লালসা, নিজের দেহের উপর ভালবাসা, মৃত্যুভয় এবং সংসারের প্রত্যেকটি পরিবেশের বিরুদ্ধে জীবন-সংগ্রাম, অর্থাৎ তাহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া পৃথিবীতে

বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা থাকে। অবশ্য এ সমস্তগুলি পশুদের ভিতরও যেমন মানুষের ভিতরও তেমনি, পার্থক্য কেবল প্রচেষ্টার তারতম্যে, শ্রেণীর মধ্যে নয়। অসভ্য বন্য-জাতিদের ভিতর এই পশু-প্রবৃত্তিগুলির বিকাশ স্বাভাবিক ও অবিশ্রান্ত, কিন্তু উন্নত সভ্যজাতির মধ্যে এগুলির বিকাশ তেমন স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ও সোজাসুজিভাবে নয়, তবে সুশৃঙ্খল ও মার্জিতভাবে থাকে। উন্নত জনসমাজে একই স্বভাব ও প্রবৃত্তিগুলি বিচিত্র সংকল্প, বিচক্ষণতা ও ভিন্ন ভিন্ন উপায়কে অবলম্বন করিয়া একই ফল উৎপন্ন করে, তবে তাহারা আকার ও বিকাশে অধিকতর উন্নত ও মার্জিত হয় মাত্র। অসভ্য ও অনুন্নত মানব-সমাজে জীবন-সংগ্রামের রূপ প্রকাশ পায় এ ধরনের যে, শারীরিক যাহারা বলবান তাহারা বাঁচিবার জন্য দুর্বলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। উন্নত সমাজ বা সভ্যজগতে তাহা একই প্রকারের ফল প্রসব করে, তবে দৈহিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা নয়। তথাপি কার্য-নৈপুণ্য, ছল, চাতুরী, কৌশল ও বিচক্ষণতার সাহায্যে যাহারা দুর্বল ও বিশেষ সক্ষম নয় তাহাদিগকে পরাজিত করিবার জন্য তাহা আত্মরক্ষা ও আক্রমণমূলক বিভিন্ন রকমের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। শারীরিক শক্তিশালী না হইলেও ঐ সকল অস্ত্রের সাহায্যে সভ্য ও তথাকথিত উন্নত সমাজ দুর্বলের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া থাকে। সুতরাং অসভ্য সমাজে ও নিম্নতর পশুতে অবিকশিত আকারে পশুপ্রবৃত্তি বিকাশ লাভ করে এবং ক্রমবিকাশের পথে

অধিকতর উন্নত, বিকশিত অথচ জটিল আকারে পৃথিবীর সভ্যসমাজে তাহা প্রকাশ পায়। অনুন্নত সমাজে শক্তি ও প্রচেষ্টা প্রধানত জাগতিক ব্যাপারের চেষ্টাতেই ব্যয়িত হয়।

কিন্তু নিম্নশ্রেণীর পশুপ্রবৃত্তি ছাড়া শ্রেষ্ঠ আর একটি প্রকৃতি মানুষের মধ্যে আছে। ইহা বিচিত্র উপায়ে এবং আকারে বিকাশ লাভ করিলেও ইহার বিকাশের ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত। সত্যের প্রতি অটুট ভালবাসা ও প্রীতি, দুর্দমনীয় কামনা-বাসনার উপর প্রভুত্ব, অহেতুক স্বার্থত্যাগ, সর্বজীবে কৃপা ও করুণা, আর্ত ও দুঃখিতকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমা, ভগবানে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণগুলি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে বিকশিত হয়। এই সদ্‌গুণগুলি কিন্তু সাংসারিক সুখ-লালসা চরিতার্থ করিবার চেষ্টারূপ পশুপ্রকৃতি হইতে ক্রমবিকশিত নয় এবং সেভাবে ইহাদের পরিচয় দিতে গেলেও ভুল করা হইবে। নিম্নস্তরের পশুদের ভিতর জীবন-সংগ্রাম নীতি ও প্রবৃত্তি থাকিলেও ঐ সদ্‌-গুণসমূহের বিকাশ তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না।[১]

১। অবশ্য পশুদের মধ্যে মানুষের মতো সদ্‌গুণের বিকাশ যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়—তাহাদের শিশু-সন্তানদের প্রতি কি অফুরন্ত স্নেহ ও ভালবাসা! কুকুরের প্রভুভক্তি ও আজ্ঞাবহতা, গরু ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের প্রভুর প্রতি অনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার ভাব সত্যই অতুলনীয়। তবে অধিকাংশ পশু বা প্রাণীদের ভিতর অবশ্য সদ্‌গুণের প্রকাশ দেখা যায় না সত্য।—সঃ

কাজেই মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত সদ্‌গুণকে কখনই পশুপ্রকৃতির পরিণতি বা পশুপ্রবৃত্তি হইতে ক্রমবিকশিত বলা যায় না। তবে ক্রম-বিকাশবাদীদের ভিতর মানুষের এই সদ্‌গুণগুলির কারণ-নির্ণয় সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। যেমন কেহ কেহ বলেন: মানুষের মধ্যে যে সমস্ত সদ্‌গুণ দেখা যায় সেগুলি ক্রমবিকাশের পথে বৈষম্য ও প্রাকৃতিক নির্বাচন নীতি অনুসারে নিম্নস্তরের পশুপ্রকৃতি হইতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়াছে। আবার কাহারও অভিমতে ঐগুলির কারণ নির্ণয় করিতে হইলে কতকগুলি উচ্চতর শক্তি, নিয়ম অথবা নিয়ন্তার প্রয়োজন।

অধ্যাপক হাক্সলি বলেন: "আমি পূর্বে যেমন আলোচনা করিয়াছি যে, যাহাকে আমরা সৎ বা সদ্‌গুণ বলি, সেই নৈতিক গুণগুলির অভ্যাস করিলে সাধারণ জাগতিক জীবন-সংগ্রামে যে কৃতকার্যতা লাভ হয়, অসদ্‌গুণগুলি তাহার বিপরীত। স্বার্থ-প্রণোদিত আত্মপ্রতিষ্ঠার স্থানে নৈতিক জগৎ চায় আত্মসংযম। প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে ঠেলিয়া না ফেলিয়া অথবা তাহা-দিগকে পদদলিত না করিয়া নৈতিক জীবন জগতের প্রত্যেকটি লোক ও প্রাণীকে ভালবাসিতে এবং শ্রদ্ধা করিতে বলে; তাহাদের সকলকে সাহায্য করিতেও বলে। নৈতিক জীবন শিক্ষা দেয়— পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সহিত যুদ্ধ করিয়া যোগ্য ও উপযুক্ত যাহার তাহারাই কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ পাইবে না, পরন্তু যতগুলি লোকের ও প্রাণীর বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা থাকিবে

তাহারা সকলেই বাঁচিবার অধিকার পাইবে। নৈতিক জীবন 'যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাঁচিতে হইবে' এই নীতিকে মোটে সমর্থন করে না। যাহারা রাষ্ট্র বা বিধিবদ্ধ সামাজিক জীবনের সুখ-সুবিধা নিজেরাই কেবল ভোগ করিতে চায় তাহাদের সেই সকল লোকের কথা মনে রাখিয়া তাহাদের নিকট ঋণী থাকা উচিত যে, তাহারা রাষ্ট্র বা সমাজকে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহা ছাড়া এ বিষয়েও তাহাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত যে, সেই সব সৃজনকারীদের চেষ্টায় গঠিত রাষ্ট্র বা সমাজসৌধ তাহাদের নিজেদের কোন প্রকার কর্মের দ্বারা যেন আঘাত প্রাপ্ত না হয়, অথবা দুর্বল হইয়া না পড়ে। আইন-কানুন, নৈতিক শিক্ষা ও উপদেশের প্রভাব প্রকৃতির সহজাত কর্ম-বৈচিত্র্যকে নিয়মিত করে; সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করিবার জন্য সকলকে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং নিজে শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নয়, ঘৃণিত বর্বর জীবনের অপেক্ষা উন্নততর জীবনকে গড়িয়া তুলিবার ও তাহার প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্যও শিক্ষা দেয়।"[২]

অধ্যাপক ক্যাল্ডারউড বলেন: "মানুষের শারীরিক গঠন সম্বন্ধে বলিতে গেলে এই কথাই বলিতে হয় যে, ক্রমবিকাশবাদ নৈতিক জীবনের বিরুদ্ধে যাইবে এমন কোন প্রবল অন্তরায় মোটে দেখা যায় না। তবে চিন্তাশীল, সুসংযত মনুষ্য-জীবনের আবির্ভাব বা বিকাশের সমস্যা সমাধান করিতে এই নীতি অথবা

২। অধ্যাপক হাক্সলি প্রণীত "এভোলিউসন এ্যাণ্ড এথিক্স" (*Evolution and Ethics*), পৃঃ ৮১-৮২

মতবাদ সম্পূর্ণ অক্ষম একথা স্বীকার করিতে হইবে।" সুতরাং যে সকল চিন্তাশীল মনীষী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে পশু-প্রকৃতি হইতে ক্রমোন্নত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন তাঁহাদের কথা যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তিযুক্ত ও সন্তোষজনক নয়। তাহা ছাড়া মানুষের উন্নত জীবন ও চরিত্রের নির্ণয় করিতে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রাকৃতিক নির্বাচনী-নীতিও যথেষ্ট নয়। কোন নীতি বা মতবাদ ঘটনাবৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে পারিলেও তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ বলিতে পারি না। অপরপক্ষে কোন মতবাদ যদি কোন একটি ঘটনা বিশ্লেষণ করিতে না পারে তবে তাহাকে আমরা নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ বলি। সেই রকম যে মতবাদ সন্তোষজনকভাবে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কারণ নির্দেশ করিতে না পারে তাহাকে আমরা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করি। প্রকৃতপক্ষে যে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে জাগতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির যাবতীয় বিকাশের রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় তাহাকেই আমরা পরিপূর্ণ নীতি বলিয়া জ্ঞান করি। সর্বোপরি যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, প্রাণীদের ভিতর পৃথক হইবার প্রবৃত্তি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা হইলেও বিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত ঐ বৈষম্যের কারণ নির্দেশ অথবা পশু-প্রকৃতি কিরূপে ক্রমবিকাশের পথে ধীরে ধীরে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয় তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই। আসলে ঐ 'পৃথক হইবার প্রবৃত্তি'-টি অনিয়ত কিম্বা কোন একটি নিয়মের দ্বারা ইহা বশীভূত—বিজ্ঞান

এ সমস্যারও সমাধান করিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া ধর্ম-তত্ত্ববিদেরা যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন: বিশ্ববৈচিত্র্য হইতে ভিন্ন অলৌকিক কোন একটি শক্তি মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে পশুপ্রবৃত্তির সহিত সংযোগ করিয়া দেয় ইহা মোটে বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ আমাদের বিচারবুদ্ধি ইহা আদৌ গ্রহণ করিতে চাহে না।

এখন দেখা যাক বেদান্ত ইহার সম্বন্ধে কি বলে। বেদান্তও ক্রমবিকাশবাদ গ্রহণ করিয়াছে। বেদান্ত বৈষম্যনীতি ও প্রাকৃতিক নির্বাচনী-ধারাও গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান প্রাণীদের ভিতর 'পৃথক হইবার প্রবৃত্তি'-র কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু বেদান্ত তাহা নির্ধারণ করিয়া নিজেকে বরং শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। বেদান্ত বলে: "আরম্ভে যে বস্তু থাকে না, পরিশেষেও সে বস্তু থাকিতে পারে না।" আরম্ভ থাকিলে তাহার শেষ থাকিবে এবং এই নীতিকে কি ক্রমবিকাশ-বাদ—কি কার্য-কারণপ্রণালীর ধারা সকলের ভিতরই দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য-কারণ-নিয়মের দ্বারাই জগতের সমস্ত বস্তু নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা যদি প্রকৃতির মহান্ সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি তবে একথা ঠিক যে, ক্রমবিকাশবাদের সাহায্যে মানুষের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক প্রকৃতি কিরূপে ধীরে ধীরে অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় বিকাশ লাভ করে তাহার পরিচয় দান করা সহজসাধ্য হইবে না। অবশ্য এই পরিচয় দানের পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক একত্ববাদের নীতি সুপরিস্ফুট রহিয়াছে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যাঁহারা একত্বের মনোবৃত্তি

লইয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বেদান্তবাদী দার্শনিকদের মতের অনুরূপ, তবে ভারতীয় দার্শনিকগণ এই একত্ব বা অদ্বৈত ভাব আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের বহুপূর্বে আবিস্কার করিয়াছেন। বর্তমান কালের একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জে. আর্থার টমসন তাঁর 'দি ষ্টাডি অফ য়্যানিমেল লাইফ' (*The Study of Animal Life*) পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ "পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত নয়, পৃথিবী অখণ্ড। অধ্যাত্ম ভাবপ্রবাহই জগতে একমাত্র সত্য। জগতের আদিতে যাহা থাকে না, অন্তেও তাহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।" বিকাশবাদীরা কিন্তু টমসনের এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার করেন না। প্রকৃতপক্ষে মনীষী টমসনের সিদ্ধান্ত ভাবিয়া দেখিবার জিনিস। টমসনের কথার অর্থ এই যে, বিকাশের গোড়াকার দিকে যাহা অব্যক্ত আকারে ছিল তাহাই ক্রমপরিণতির উত্তরোত্তর স্তরে ধীরে ধীরে পূর্ণবিকাশিত হইয়াছে। যদি একথা আমরা স্বীকার করি যে, অবিভক্ত ও অখণ্ড একটি প্রাণপঙ্ক অথবা সূক্ষ্ম জীবাণু ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া পরিশেষে শ্রেষ্ঠ বিকাশসম্পন্ন মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা হইলে ইহাই আমাদের আবার স্বীকার করিতে হইবে যে, উন্নত হইবার শক্তি নিশ্চয়ই অব্যক্ত আকারে সেই প্রাণপঙ্ক বা জীবাণুতে পূর্ব হইতে নিহিত ছিল, কেননা সার্বভৌমিক নিয়ম এই যে,—'যাহা অন্তে থাকিবে তাহা নিশ্চয়ই আদিতে ছিল।' মোটকথা পশু ও শ্রেষ্ঠ মানব-প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, আত্মা এই সমস্তই অব্যক্ত আকারে প্রাণ-পঙ্ক বা প্রাণবীজে সুপ্ত ছিল। এই নিয়মকে যদি আমরা স্বীকার

না করি তবে এই সমস্যার উদ্ভব হইবে: কিরূপে তাহা হইলে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থা সম্ভবপর হয়? নাস্তি কিরূপে তাহা হইলে অস্তি রূপে প্রতিভাত হয়? কিরূপেই বা অসৎ হইতে কোন সদ্‌বস্তুর সৃষ্টি হইতে পারে? কি প্রণালীতে তাহা হইলে যে বস্তু কখনও পূর্বে ছিল না তাহার উৎপত্তি হয়? যে বস্তু পূর্বে কোন-দিনই ছিল না তাহার উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব হয়? অথচ বেদান্তের মতে প্রত্যেক জীবাণুতে অনন্ত বিকাশ ও সম্ভাবনার বীজ নিহিত থাকে। আর ইহাও সত্য যে, যে শক্তি অব্যক্ত আকারে থাকে, তাহাতে পরিপূর্ণ আকারে ও কার্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করিবার শক্তিও থাকে। ঐ অব্যক্ত শক্তি যখনই কার্যাকারে প্রকাশ পাইতে চেষ্টা করে তখনই পারিপার্শিক পরিবেশ অনুযায়ী উপযুক্ত অবস্থা গ্রহণ করিয়া অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া যায় ততক্ষণ অব্যক্ত থাকিয়া পরে তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং বেদান্তের মতে অব্যক্ত যখনই ব্যক্ত আকারে প্রকাশ পায় তখনই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। প্রাণ ও মনের যখনই বিকাশ আরম্ভ হয় তখনই জীবাণুতে অব্যক্ত আকারে নিহিত শক্তিগুলি স্থূল কার্যরূপে বাস্তব জগতে প্রকাশ পায় ততক্ষণ কেহ তাহার পরিমাণ কল্পনা করিতে পারে না। যে পূর্বে কখনও বটবৃক্ষ দেখে নাই সে বটবৃক্ষের বীজ দেখিয়া কখনও অনুমান করিতে পারে না যে, কী শক্তি ঐ বটবীজের মধ্যে সুপ্ত আকারে নিহিত আছে! নবজাত শিশুকে দেখিয়া কেহই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না যে, ঐ শিশু শ্রেষ্ঠ একজন সাধু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একজন শিল্পী, একজন

দার্শনিক, একটি নির্বোধ অথবা অতীব নিকৃষ্ট একজন দুর্বৃত্ত হইবে কিনা ! পিতামাতারাও শিশুদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানে না। প্রকৃতপক্ষে শিশুরা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে নিহিত অব্যক্ত শক্তিসমূহ ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে। যে সকল শক্তি বিশেষ প্রবল তাহারা অন্যান্য শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে ও কিছুদিনের জন্য তাহাদের গতিকে রুদ্ধ করে। কিন্তু প্রবল শক্তিদ্বারা অবরুদ্ধ দুর্বল ও অব্যক্ত শক্তিসমূহ অনুকূল অবস্থা পাইলে পুনরায় বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় যেমন—সহস্র বৎসর ধরিয়া রাসায়নিক শক্তি কোন দ্রব্যে অব্যক্তভাবে থাকিতে পারে, কিন্তু প্রতিকারক বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া সুযোগ সুবিধা পাইলেই তাহা আবার বিকশিত হইয়া নির্দিষ্ট কোন ফল প্রসব করে। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া রাসায়নিক তাম্র ও দস্তার মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সুপ্ত আকারে লুক্কায়িত ছিল এবং রৌপ্যের সমতুল্য তাম্র প্রভৃতিও অনাবিস্কৃত-ভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু যখনই ঐ তাম্র, দস্তা ও রৌপ্যকে একত্রিত করিয়া অনুকূল একটি অবস্থার মধ্যে আনা হইল তখনই তাহা হইতে রৌপ্যের বিকাশ হইল। দুই বা তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া একটি বৃক্ষের বীজ বৃক্ষ জন্মিবার শক্তিকে সুপ্ত অবস্থায় রাখিয়া দিতে পারে, কিন্তু অনুকূল অবস্থা পাইলে বীজের ঐ শক্তি আবার বিকশিত হয়। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্যার জি. উইল্‌কিন্‌সন্ থিবসের কবরস্থানে রক্ষিত একটি পাত্রে একটি গমের বীজ ছিল। ঐ গমের বীজটি তিন হাজার বৎসর ধরিয়া ঐ পাত্রে রক্ষিত ছিল এবং কবরের ভিতরে বায়ু প্রবেশের পথটি

বাতাসশূন্য অবস্থায় দৃঢ়রূপভাবে সর্বদা আবদ্ধ ছিল। মিঃ পেটিগ্রু যখন ঐ বীজটী লইয়া মাটিতে রোপণ করিয়া ছিলেন তখন তাহা হইতে গাছ জন্মিয়াছিল। মিশরে (Egypt) একটি মমির (mummy) হাতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে রক্ষিত একটি বৃক্ষের মূল বা শিকড় পাওয়া যায়; সেই বৃক্ষমূলটিকে একটি পুষ্পপাত্রে রোপণ করার পর তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মিয়াছিল এবং সতেজে তাহা বর্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, যখনই কোন সুপ্ত শক্তি অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশ প্রাপ্ত হয়, সহস্র সহস্র বৎসর পরে হইলেও তাহা পুনরায় ব্যক্ত ও বিকাশিত হয়।

ঠিক এইরূপ সুপ্ত মানসিক শক্তিসমূহেরও উদাহরণ দেওয়া যায়। আমাদের মনের স্বাভাবিক স্তরে বহুদিন ধরিয়া ঐ সকল শক্তি সুপ্ত থাকিলেও উন্মত্ততা, প্রলাপ, বায়ুরোগ, মূর্ছা বা সম্মোহন-নিদ্রা প্রভৃতির ন্যায় মনের কতকগুলি অস্বাভাবিক অবস্থাও আছে যেগুলি আমাদের জাগ্রত মনের স্তরে ভাসিয়া উঠে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশোন্মুখ অন্যান্য শক্তিগুলিকে বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া দেয়। বাগ্মিতা, সংগীত ও চিত্রবিদ্যা এবং কতকগুলি যান্ত্রিক বিদ্যায় দক্ষতা প্রভৃতির সাধারণ বা স্বাভাবিক অবস্থায় কোনকালে বিকাশ দেখা যায় না, কিন্তু এ ধরনের অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ কখনও কখনও পাগল অবস্থায় কাহারও মধ্যে দেখা যায়। নিদ্রিত অবস্থায় জাগরিতের মতো যাহারা ভ্রমণ করে তাহারাও গভীর নিদ্রাবস্থায় অঙ্কশাস্ত্রের অতীব দুরূহ ও জটিল প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করে এবং এরূপ কার্য

করিয়া বসে যাহা স্বাভাবিক জ্ঞানের অবস্থায় তাহাদিগকেই বিস্ময়াভিভূত করিয়া ফেলে। সুতরাং ইহা হইতে বোঝা যায়, প্রত্যেকের মন বিভিন্ন শক্তি, সংস্কার ও ভাবের এক একটি ভাণ্ডার বিশেষ এবং ঐ শক্তি, সংস্কার ও ভাবের কতকগুলি মাত্র মনের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশিত হয়, আর কতকগুলি অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত অবস্থায়ই থাকিয়া যায়। ঠিক সেইরূপ আমাদের শরীর ও মনের বর্তমান অবস্থা মনের অচেতন স্তরে সুপ্ত শক্তি-গুলির ব্যক্ত বা প্রকাশ মাত্র। অব্যক্ত নূতন শক্তিসমূহ ব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিলে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া আবার নূতন আকার ধারণ করে। প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে সুপ্ত শক্তিগুলি এক হইতে অন্য আকারে প্রকাশিত হইবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে ভারতীয় বিকাশবাদী দার্শনিক পতঞ্জলিও বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ঋষি পতঞ্জলি যীশুখৃষ্ট জন্মিবার বহু শতাব্দী পূর্বে জীবিত ছিলেন এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে নিজে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।[১] পাতঞ্জলদর্শনের

১। পাঠক-পাঠিকাদের মনে রাখা উচিত—খৃষ্ট-অব্দ আরম্ভ হইবার পূর্বে ভারতে ক্রমবিকাশবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা বর্তমান ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে বিকাশবাদের জন্মগুরু মহর্ষি কপিল সর্বপ্রথম যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে ক্রমবিকাশনীতি প্রচার করেন।

স্যার মনিয়র উইলিয়ামও বলিয়াছেন: "কালাতিক্রম দোষ আসায় নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হয় যে, স্পিনোজার দুই হাজার বৎসর এবং ডারুইনের বহু শতাব্দী পূর্বেও হিন্দুরা স্পিনোজা ও ডারুইনের মতবাদ হুবহু প্রচার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিকগণ এই ক্রমবিকাশবাদ

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন : 'প্রকৃত্য-পূরণাৎ জাত্যান্তরপরিণামঃ।'

প্রকৃতির যে পরিপূরণ হয় তাহা সম্পূর্ণ প্রাণীদের ভিতর হইতে হয়—বাহির হইতে নয়। বাহির হইতে বা বাহ্যজগৎ হইতে কোন-কিছু নূতন করিয়া সংযোগ করা হয় না ; সমস্ত জিনিসের কারণ বা বীজই প্রাণীদের ভিতরে থাকে, তবে তাহাদের বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও অবস্থার সাহায্য দরকার। আমরা হয়তো অকস্মাৎ কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোককে পরিবর্তিত হইয়া সাধু বা সৎস্বভাবসম্পন্ন রূপে দেখি। হত্যাকারী বা দস্যু সাধুতে পরিবর্তিত হইয়াছে এরকম উদাহরণও আমরা দেখিতে পাই। ধর্মবিশ্বাসী কোনও ব্যক্তি হয়তো এ পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিবেন—সর্বশক্তিমান ভগবানের করুণা ও আশীর্বাদ তাহাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে, সুতরাং সমগ্র প্রকৃতি বা স্বভাবের রূপান্তর হইয়াছে। বেদান্তও একথা সমর্থন করিবে না। বেদান্তের মতে তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি; অর্থাৎ ভাল হইবার প্রবৃত্তি সুপ্ত বা অব্যক্ত আকারে সকলের

গ্রহণ করিবার এবং 'বিকাশ' অথবা 'ক্রমবিকাশ' শব্দ পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ভাষায় সৃষ্ট হইবার পূর্বে ভারতবর্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ক্রমবিকাশবাদ লইয়া আলোচনা করিয়াছে"—('হিন্দুইজম্ এ্যাণ্ড ব্রাহ্মিনিজম্', পৃঃ ১২।) অধ্যাপক হাক্সলিও বলিয়াছেন : 'টারসাসের পল্ জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্বেও ভারতীয় মনীষীরা যে ক্রমবিকাশবাদ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়। —'সায়েন্স এ্যাণ্ড হিব্রু ট্র্যাডিসন্', পৃঃ ৫০

মধ্যে থাকে, তাহা জাগ্রত বা ব্যক্ত হইলে হঠাৎ পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হয়। তবে কেহ কখনও বলিতে পারে না যে, কখন অথবা কি করিয়া ঐ সুপ্ত শক্তিসমূহ জাগ্রত হইয়া বিকশিত হয়। প্রত্যেকের প্রাণবীজে, অথবা সাধারণভাবে আমরা যাহাকে আত্মা বলি তাহাতে বিচিত্র আকারে বিকশিত হইবার অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত থাকে। প্রত্যেক আত্মা তাহার প্রকৃতিরূপ বিরাট গ্রন্থের এক একটি পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করিতে থাকে এবং যখন তাহাদের সমগ্র গ্রন্থটির পাঠ শেষ হয়, অথবা যখন ক্রমবিকাশের সকল স্তরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাহারা লাভ করে তখনই বিকাশের স্রোতের মধ্যে তাহাদের আর পতিত হইতে হয় না, পরিপূর্ণ জীবন লাভ করিয়া তাহারা তখন জন্ম-মৃত্যুরূপ তরঙ্গকে অতিক্রম করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রকৃতিরূপ গ্রন্থের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা পড়িয়া আমাদের সাধারণ স্বভাবের সম্বন্ধে জানিতে পারি; অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান জন্ম পর্যন্ত প্রত্যেকটি পশু-প্রবৃত্তির স্তরকে অতিক্রম করিয়া সাধারণ প্রকৃতি বিষয়ে আমরা জ্ঞান অর্জন করি। মোটকথা আমাদের প্রকৃতিরূপ গ্রন্থের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠার অভিজ্ঞতা ক্রমাগতই আমরা সঞ্চয় করিতেছি। যে কেহ ইহাকে পুনরায় পড়িয়া ইহার সম্বন্ধে ভাল করিয়া জ্ঞান অর্জন করিতে চায় তাহাকে এইরূপ করিতে হইবে, তাহাকে পশুপ্রকৃতির পর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। যেমন কোন পুস্তক সমগ্র পড়া হইলেও যদি কোন একটি বিশেষ অধ্যায়কে উত্তমরূপে জানিতে

ইচ্ছা হয় তবে তাহাকে আবার পড়িতে হইবে এবং সেই অধ্যায়টি পড়িয়া সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নূতন কোন অধ্যায় আর আরম্ভ হইবে না, ঠিক সেরূপ জীবনরূপ গ্রন্থের কোন একটি পৃষ্ঠা পড়িয়া যতক্ষণ না কেহ সন্তুষ্ট হইতেছে ততক্ষণ সে সেই পৃষ্ঠা পড়িতে থাকিবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, আমাদের জীবন ক্রমবিকাশের স্তর অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে সর্বদা অগ্রসর হয়। কিন্তু কেহ যদি বিকাশের একটি স্তর বা অবস্থা হইতে উচ্চতর স্তরে বা অবস্থান্তরে যাইবার সময় পূর্বস্তরে আরও কিছুদিন থাকিতে চায়, তবে সে সেখানে থাকিতে পারে। পরে ঐ স্তর বা অবস্থায় তৃপ্তি লাভ করিলে অন্য স্তরেও সে গমন করিয়া সেখানকার জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। তবে ক্রমবিকাশের এই স্তরগুলির একটির পর অপরটিতে গতি কাহারও মন্থর এবং কাহারও বা দ্রুত হয়। কিন্তু বিকাশ ধীর অথবা দ্রুতগতি হইলেও প্রত্যেক প্রাণীকেই পরিপূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত বিকাশের সমস্ত স্তরগুলিকে অতিক্রম করিতে হইবে।

বেদান্তের মতে ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিপূর্ণতা বা মুক্তি লাভ করা। পশুজীবন সম্পূর্ণ দৈহিক বিকাশের উপর নির্ভর করে। এই পশুজীবন মানব-জীবনে পূর্ণতা লাভ করে। জাগতিক অবস্থার বিষয় অনুশীলন করিয়া দেখিলে বিকাশের শ্রেষ্ঠতর স্তর হিসাবে মনুষ্য-জীবনকেই গণ্য করা যায়; পশু অপেক্ষা মনুষ্য-জন্মই শ্রেষ্ঠ। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ক্রমবিকাশনীতির গতি ও উদ্দেশ্য পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া। এই পূর্ণতা যখন

লাভ করা যায় তখনই বিকাশবাদের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

মানুষই ক্রমবিকাশের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। মনুষ্য ব্যতীত জগতে অন্য কোন উন্নততর বিকাশ সম্পন্ন প্রাণী আর নাই। সুতরাং একথা যদি আমরা বলি যে, দৈহিক বিকাশের চরম উদ্দেশ্য জৈব বা প্রাণী-শরীরের পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করা তাহা হইলে এরূপ বলা ন্যায়সংগত হয়। তাহা ছাড়া একথাও সত্য যে, সমগ্র বিশ্বে প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্য ও প্রণালী যদি সকল সময় একরূপ হয় তাহা হইলে বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের উদ্দেশ্য তখনই সার্থক হইবে যখন এগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ হইবে। বৌদ্ধিক পরিপূর্ণতার অর্থ বুদ্ধির চরমবিকাশ। বুদ্ধি পরিপূর্ণরূপে বিকাশসম্পন্ন তখনই হয় যখন 'শুদ্ধমন' রূপে জাগতিক সমস্ত জিনিসের যথার্থ রূপ ও প্রকৃতিকে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে এবং মিথ্যাকে সত্য, জড়কে চৈতন্য অথবা অনিত্যকে নিত্য বলিয়া কখনও ভ্রম করে না। স্বার্থপরতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইলে নৈতিক পূর্ণতা সিদ্ধ হয় এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা তখনি লাভ হয় যখন শাশ্বত, নিত্যমুক্ত, অদ্বিতীয় ও চিরপবিত্র পরমার্থ সত্যস্বরূপ সর্বব্যাপী ভগবানকে আমরা লাভ করি। এই শাশ্বত সত্যের কল্যাণময় রূপ যথার্থভাবে প্রকাশিত হইলে ক্রমবিকাশ শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করে। প্রকৃতির স্বভাবই তাহার সকল শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া তোলা। শক্তিগুলির বিকাশও ঠিক এভাবে হয় যে, যেগুলি প্রবল ও বিকাশোন্মুখ শক্তি সেগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয় এবং অবশিষ্ট

শক্তিগুলি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বিকাশের প্রণালী লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিব, পশুপ্রকৃতি প্রবলভাবে প্রকাশিত হইলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অব্যক্ত থাকিয়া যায়। আবার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ হইলে পশুভাব বা নীচ প্রকৃতিগুলির আর বিকাশ হয় না। এজন্য আমরা দেখিয়া থাকি যে, নিম্নস্তরের পশু বা প্রাণীতে ও এমন কি—যে সকল মনুষ্য পশুর ন্যায় জীবনযাপন করে তাহাদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ হয় না। তাহার পর একথা সত্য যে, মানুষই একমাত্র প্রাণী যাহাতে কি নৈতিক—কি আধ্যাত্মিক উভয় প্রকৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

মানুষের যখন আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ হয় এবং সেইভাবে সে উদ্বুদ্ধ হয় তখন তাহার নীচ বা পশুপ্রবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে দুর্বল ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। উন্নত প্রবৃত্তিগুলির বিকাশের সংগে সংগে নীচ প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ সংকুচিত হইয়া যায়, তাহাদের শক্তিগুলির রূপান্তর হয় এবং পরিশেষে সেগুলি অদৃশ্য হইয়া যায় আর কখনও তাহারা বিকশিত বা ব্যক্ত হয় না এবং তখনই মানুষ সমস্ত নীচ ব পশুপ্রবৃত্তির তাড়না হইতে মুক্তি লাভ করে।

কি উচ্চ ও কি নীচ সকল বিকাশে ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। মানুষ বা যে কোন প্রাণী যতক্ষণ পর্যন্ত যে যে স্তরে অবস্থান করে ততক্ষণ সে তাহাতে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন সে একটি স্তরকে অতিক্রম করিয়া অন্য স্তরে উপস্থিত হয় তখন সেই পূর্বের স্তর আর তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। পুনরায় যখন

সমস্ত স্তর ও বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবের স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া পূর্ণতা বা মুক্তিরূপ চরমস্তরে উপনীত হয় তখনই সে শাশ্বত ও পবিত্র আত্মসত্বাকে উপলব্ধি করিতে পারে; তখনই তাহার যথার্থ ব্যক্তিত্ব ও সত্বার স্ফুরণ হয়। সত্যজ্ঞান ও বিবেক না থাকার জন্যই যখন যে অবস্থায় সে বাস করে তখনই সেই অবস্থার শক্তিগুলির সংগে নিজের ব্যক্তিত্ব ও সত্বাকে একাকার করিয়া ফেলে, পৃথক করিতে পারে না। ফলে ভুল করিয়া সে মনে করে যে, প্রত্যেক অবস্থার পরিবর্তন ও বিকার তাহাকে অভিভূত করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বিবেকের বশে সে পুনরায় উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহার সত্বা চিরদিন অবিকৃত ও পবিত্র। বিকাশের স্তর ও অবচ্ছেদগুলির ক্রমাগত পরিবর্তন হইলেও সে তাহার যথার্থ সত্বাকে শুদ্ধভাবে তখন প্রকাশিত বলিয়া অনুভব করে। স্তরগুলির বিকাশ ও শরীরের পরিবর্তন হইলেও আত্মা বা শরীরী সর্বদা এক ও অবিকৃত থাকেন, তাঁহার কখনও পরিবর্তন হয় না। বিভিন্ন রঙের কাঁচযুক্ত একটি লণ্ঠনের ভিতর আলোকশিখা থাকিলে তাহার রশ্মিগুলি যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়, প্রাণীদের আত্মাও সেরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত হয়। পশুশরীরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইলে আত্মায় পশু প্রবৃত্তিরই বিকাশ হয়। অথবা সূক্ষ্ম মানব-শরীরে প্রকাশ পাইলে তাহাতে মানবীয় সূক্ষ্ম শক্তিসমূহেরই বিকাশ হয়। প্রাণীদের সূক্ষ্মশরীরে পশুপ্রকৃতি হইতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভূমিতে প্রকাশিত হইলে তাহারা পবিত্র প্রবৃত্তির অধিকারী হয়, সুতরাং ইহা সত্য যে, সূক্ষ্মশরীরের বিভিন্ন প্রকার বিকার বা পরিবর্তন

হয়। যে কোনওএকটিমাত্র শরীর বা জন্মে যখন পাশবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকএইসকলস্তরের বিকাশ সম্ভব নয়, তখন পুনর্জন্মবাদরূপ নীতি বা সত্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কেননা পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিলে জীবাণুর যে ক্রমবিকাশ আছে, অথবা প্রত্যেক প্রাণীই যে বহুবার জন্মায় ও বহুশরীর ধারণ করে একথা মানিয়া লইতে হইবে। ইহা না মানিলে ক্রমবিকাশবাদকে অসম্পূর্ণ, বিকৃত ও উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া প্রমাণ করা হইবে। তবে পুনর্জন্মবাদকে যদি আমরা এভাবে স্বীকার করি যে, সূক্ষ্মশরীরের পরিণতি ক্রমশঃ হইলেও নিরবিচ্ছিন্ন অসংখ্য শরীরের ভিতর দিয়াই তাহার বিকাশ সম্ভব হয়, তাহা হইলেও ক্রমবিকাশবাদের সহিত তাহার কিছু পার্থক্য মানিতে হইবে স্থূলশরীর থাকিতেও পারে বা তাহার ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম-শরীরের নাশ হইবে না, স্থূলশরীর নষ্ট হইয়া গেলেও সূক্ষ্মশরীর অন্য কোন আকার বা শরীর ধারণ করিয়া থাকিবে।

তবে এই পুনর্জন্মনীতিকে ঠিক ঠিকভাবে বুঝিতে পারিলে ক্রমবিকাশের পরিপূরক বা সহায়ক বলিয়াই মনে হইবে। কারণ পুনর্জন্মবাদ ব্যতীত ক্রমবিকাশ কখনও সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত হইতে পারে না। ক্রমবিকাশের দ্বারা প্রাণ বা জীবনের ক্রমসঞ্চরণ এবং পুনর্জন্মের দ্বারা প্রাণ বা জীবনের চরম গতি সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি। সুতরাং বিকাশ ও জীবন-নীতিকে পরিপূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে আমাদের এই উভয়ের সমষ্টিকে বুঝিতে হইবে, একটিকে বাদ দিয়া অপরটি সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

জেমস্ ফ্রিম্যান ক্লার্ক বলিয়াছেন: 'মানুষ যে অসংখ্য নিম্নস্তরের বিকাশ অতিক্রম করিয়া বর্তমান আকারে ও অবস্থায় উপনীত হইয়াছে সেই সাধারণ নিয়মকে আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে। যাহাকে আমরা ক্রমবিকাশ বলি তাহার অর্থ হইল: অসংখ্য নিকৃষ্ট ও পশু-জন্ম অতিক্রম করিয়া তবে আমরা বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। তবে একথা সত্য যে, ডারুইন যে ক্রমবিকাশের কথা বলিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র শরীরের ক্রমবিকাশ, আত্মার নয়। আমার মনে হয়—এই দুইটি বিকাশকে যদি আমরা একসঙ্গে মানিয়া লই তাহা হইলে বহু জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারিব, কারণ তাহা না হইলে প্রাকৃতিক নির্বাচন ও জাগতিক পরিবেশের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঁচিবার যে উপযুক্ত সে-ই মাত্র বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার দ্বারা এই নীতি ও সমস্যা দুইটির কোন মীমাংসা করা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং বিকাশ বলিতে শরীর ও আত্মা এই দুইটির বিকাশই একসঙ্গে আমাদের স্বীকার করা উচিত। এই ধরনের বিকাশনীতিকে বিশ্বাস করিলে আত্মা যে ভিন্ন ভিন্ন নূতন শরীর ধারণ করে একথাকেই সমর্থন করা হয়; আর তাহা হইলে বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পরের মধ্যে মিতালী ও যোগসূত্র পাওয়াও সম্ভবপর হয়। কাব্যও এ নীতিকে তাহার ভাবসৌন্দর্যের সহায়তা না করিয়া থাকিতে পারে না।'[১] কারণ-শরীরের বিকাশ প্রাণবীজ

১। ফ্রিম্যান ক্লার্ক প্রণীত 'টেন গ্রেট রিলিজিয়নস্' (Ten Great Religions), ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯০

বা প্রাণপক্ষের বিকাশের উপর নির্ভর করে। এই দুইটির সহযোগিতা ও মিলনেই ক্রমবিকাশ বা পুনর্জন্মের অর্থ সার্থক হয়।

সুতরাং ক্রমবিকাশবাদকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে পুনর্জন্মবাদের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক হয়। যদি আমরা স্বীকার করি যে, কোন একটি জীবাণু বিচিত্র স্থূলবিকাশের মধ্য দিয়া অবচ্ছিন্ন গতিতে বিকশিত হয়, তাহা হইলে একথা ঠিক যে, আমরা পুনর্জন্মবাদকেই অজ্ঞাতভাবে স্বীকার করি। জীবাণুরা ভিন্ন ভিন্ন শরীর ও বিকাশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেও তাহাদের একত্ব সত্তা অথবা ব্যক্তিত্বের কোনটিরই পরিবর্তন হয় না। একটি অণু-পরিমাণ প্রাণবীজ খনিজ, উদ্ভিদ প্রভৃতি পদার্থের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া পশুশরীর ধারণ করিলেও তাহার যেরূপ অখণ্ডতা ও ব্যক্তিত্ব[২] নষ্ট হয় না, সেরূপ জীবাণু ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের স্তর অতিক্রম করিলেও তাহার একত্ব বা সত্তাকে সে কখনই হারায় না।

ভগবদ্গীতায়ও আছে: বিকাশে সাধারণ একটি জীবনের যেমন আমরা শৈশবকালের শরীর হইতে যৌবন-শরীরে এবং যৌবন হইতে পরে বৃদ্ধশরীরে প্রবেশের সংগে সংগে পূর্ব-পূর্ব জন্ম বা জীবনের সমস্ত সংস্কার, ভাব ও অভিজ্ঞতা-গুলিকেও বহন করিয়া চলি এবং যথাসময়ে সেগুলিকে আবার প্রকাশ করি, আত্মাও তেমনি একটি জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিলে অন্য একটি নূতন দেহকে আশ্রয় করে এবং তাহার সংগে

২। অবশ্য ব্যক্তিত্ব বলিতে যদি একটি অণুরও ব্যক্তিত্ব আছে একথা আমরা স্বীকার করিয়া লই তবেই এ যুক্তি সম্ভবপর হয়।

সূক্ষ্মশরীর ও তাহাতে নিহিত পূর্ব-পূর্ব অসংখ্য জন্মের সংস্কারগুলিকে সে বহন করিয়া লইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহা জানিয়া শোক ও মৃত্যুকে আর ভয় করেন না।[১] জ্ঞানীরা জানেন যে, মৃত্যু একটি দেহ হইতে অন্য দেহে যাওয়া রূপ পরিবর্তন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সুতরাং কেহ যদি একজন্মে সৎ প্রকৃতির দ্বারা নীচ প্রকৃতিকে জয় করিতে না পারে, তবে সেজন্মে যেখানে সে তাহার জীবনের যাত্রা সমাপ্ত করিয়াছে পরজন্মে ঠিক সেইখান হইতে সে পুনরায় আরম্ভ করিয়া তাহা জয় করিতে পারিবে ; তাহাকে আর প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে না। পূর্বজন্মে যেখানে সে থামিয়াছে সেখান হইতেই সে আবার আরম্ভ করিবে। অতএব দেখা যাইতেছে পুনর্জন্মরূপ নীতি বিকাশের একটি ন্যায়সংগত পরম্পর্য বিশেষ। এই পুনর্জন্মনীতির দ্বারাই ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় এবং সংগে সংগে মানুষের নৈতিক ও অধ্যাত্ম-প্রকৃতির রহস্যও প্রকাশিত হয়।

১। "দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥" —গীতা ২।১৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুনরুত্থান—না পুনর্জন্ম বিজ্ঞানসম্মত?

ইতিহাসের পথচারীমাত্রেই খৃষ্টানদিগের পুনরুত্থানের ধারণা সর্বপ্রথমে কোথায় উৎপন্ন হইল ও কিভাবে অন্যান্য জাতি তাহা গ্রহণ করিল তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইবেন। মোজেসের নামে প্রচলিত ও ওল্ড টেষ্টামেণ্টের উক্তিগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলে দেখা যায়, প্রাচীন ইস্‌রেলাইটরা খৃষ্টানদের প্রবর্তিত মৃত্যুর পর স্বর্গ অথবা নরক, পাপের শাস্তি বা পুণ্যের পুরস্কার এ সকলের কোনটিই বিশ্বাস করিত না। তাহা ছাড়া মানুষের স্থূলশরীর নষ্ট হইয়া গেলে আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা সে সম্বন্ধেও তাহাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল কিনা সন্দেহ। পরলোক সম্বন্ধেও তাহাদের নির্দিষ্ট কোন ধারণা ছিল না। মৃত্যুর পর আত্মা বা দেহের পুনরুত্থানেও তাহারা বিশ্বাস করিত না।

জোব তাহার মানসিক দুঃখের শান্তির জন্য মৃত্যু কামনা করিয়াছিল। খৃষ্টানদের ধর্মসংগীতেও (Psalms) উল্লেখ আছে :

(১) 'মৃতের উদ্দেশে কভু করিবে কি বিস্ময় প্রকাশ?
সমাধি হইতে উঠি গাহিবে কি প্রশংসা তোমার?'[১]

(২) 'মরণে থাকে না কভু স্মৃতিশক্তি তব?
সমাধিতে কেবা দিবে ধন্যবাদ তোমা?'[২]

১। Psalms, LXXX VIII, 10.

২। Ps. VI, 5.

পুনরায় নৃপতিবর্গ ও মানব-সন্তানের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে,

(১) 'শেষ নিঃশ্বাস তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং ঠিক সেদিনই তাঁহার পূর্বচিন্তা বা স্মৃতিও বিলুপ্ত হইবে।'[৩]

(২) 'মৃত আত্মারা ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রশংসা-গান করে নাই, কিম্বা চিরদিনের জন্ম যাহারা সমাধি-শয়নে ঘুমাইয়া আছে তাহারাও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছুই স্তুতি গান করে নাই।'[৪]

সোলোমন বীরত্বের সঙ্গে বলিলেনঃ 'মৃত্যুর পর সকলের সংগে সকল জিনিষই আবার ফিরিয়া আসে। পুণ্যাত্মা, পাপী, সাধু, পবিত্র ও অপবিত্র সকলের অদৃষ্টেই ঠিক এক রকম ঘটনা ঘটে। * * * পুণ্যাত্মা ও পাপী সকলেই মৃত্যুর কবলে পতিত হয়, কেহই পরিত্রাণ পায় না।'[৫] 'তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন কর। আনন্দে তোমার খাদ্য গ্রহণ কর এবং স্বচ্ছন্দ মনে তুমি মধু পান কর। * * * তোমার প্রিয়তমার সহিত আনন্দে তুমি বাস কর * * * কেননা যে সমাধিতে তুমি গমন করিতেছ সেখানে কোন কল্পনা, অভিজ্ঞতা অথবা জ্ঞানের লেশমাত্র নাই।'[৬] পুনরায় ইহারই পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছেঃ 'মৃত আত্মা কোন-কিছু জানে না, কিম্বা কোনরূপ উপহারও সে আর পাইবে না, কারণ তাহার স্মৃতি চিরদিনের জন্য মুছিয়া

৩। Ps. CXIVI, 4.
৪। Ps. CXV, 17.
৫। Eccl. IX, 2.
৬। Eccl. IX, 7, 9, 10.

গিয়াছে।' সোলোমন পুনরায় বলিয়াছেন: 'মানুষের ভাগ্যে যাহা ঘটিবে, মৃত্যুর পর পশুদের ভাগ্যেও তাহা ঘটিবে। ঘটনার বিপর্যয় হয় না, সকলের ভাগ্যে একরূপই সর্বদা ঘটে। যেভাবে একজনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অপরেও ঠিক সেভাবে মৃত্যুকে বরণ করে। সকলের শেষ-নিঃশ্বাস একরকম ভাবেই বহির্গত হয়, সুতরাং মানুষ যে পশু অপেক্ষা প্রাধান্য বা উৎকর্ষ লাভ করিবে তাহা হইতে পারে না।' 'সকলে একই স্থানে গমন করিবে। ধূলিকণা হইতে সকলে আসিয়াছে, মৃত্যুর পর আবার ধূলিকণাতেই ফিরিয়া যাইবে।' 'কে বলিতে পারে যে, মানুষের আত্মাই ঊর্ধ্ব-দিকে স্বর্গে গমন করিবে আর পশুদের আত্মা নিম্নগামী হইয়া পৃথিবীলোকে ফিরিয়া আসিবে?'[৭]

এই রকমের বহু উক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় ও তাহা হইতে পরিষ্কারভাবে আমরা বুঝিতে পারি যে, বাবিলোনিয়ান্ ক্যাপ্টিভিটির (বাবিলোন অবরোধের) পূর্বে ইস্‌রেলাইটরা দণ্ড বা পুরস্কার, স্বর্গ বা নরক অথবা মৃত আত্মাদের পুনরুত্থান প্রভৃতির কোনটাই বিশ্বাস করিত না। কেহ কেহ বলেন তাহারা শিওল (sheol)[৮], প্রেতলোক অথবা নরককুণ্ড স্বীকার করিত এবং ইহাও বিশ্বাস করিত যে, মৃত্যুর পর পরলোকগামী

৭। Eccl. III, 19-21.

৮। 'শিওল' হিব্রু শব্দ। শিওল অর্থে প্রেতলোক, নরক বা যমপুরী।

আত্মারা ঐস্থানে বাস করে এবং কখনও তাহাদের পুনরুত্থান হয় না। ৫৩৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে পারসিকরা যখন ইহুদীদিগকে পরাজয় করে তখন ইহুদীরা এমন একটি জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন : ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, স্বর্গ ও নরক আছে, মৃত্যুর পর জীবাত্মার পুনরুত্থান, পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার এবং বিচারেরশেষদিন প্রভৃতিরও অস্তিত্ব আছে। পারস্য-রাজ্যের শাসন বাবিলোন অবরুদ্ধ হইবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৩৬-৩৩৩ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ইহুদীরা এই পারস্যরাজ্যের শাসনাধীনে থাকিবার সময় পারসিকধর্মের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। তাহারা পৌত্তলিকতা বর্জন করিয়া ধীরে ধীরে সামাজিক ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং সর্ববিষয়ে স্বাধীনতাও তাহাদের যথেষ্ট ছিল। ঠিক এই সময়ে ইহুদীরা ফারিসিজ্ ও সাতুসিজ্ এই তুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। পারসিকদের ধর্মভাবকে যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে 'ফারিসি' বলা হইত। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন 'ফারিসি' হিব্রু শব্দ—'পারসি' বা 'পার্শি' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা ইহুদীয় ভাব, ধর্মানুষ্ঠান, পূজা-উৎসবগুলিকে বিশ্বাস ও অনুসরণ করিত তাহাদের 'সাতুসিজ' বলা হইত। তবে ফারিসিজ ও সাতুসিজ সম্প্রদায় তুইটি ধর্মবিশ্বাসে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ফারিসিজসম্প্রদায় দেব-দেবী, তাহাদের পূজা ও অপদেবতা প্রভৃতি বিশ্বাস করিত। মৃত্যুর পর আত্মার পুনরুত্থান, ভবিষ্যৎ দণ্ড ও পুরস্কার এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা তথা অদৃষ্ট প্রভৃতিও তাহারা বিশ্বাস করিত। সাতুসিজরা কিন্তু পুরাতন ইহুদীয় ধর্মের সকল কিছুই

মানিয়া চলিত। সুতরাং তাহারা অত্যন্ত গোঁড়া ও পুরাতন মতবাদ বিষয়ে রক্ষণশীল ছিল। তাহারা দেবদেবী বা অপদেবতা, মৃত আত্মার পুনরুত্থান বা মৃত্যুর পর ঈশ্বর কর্তৃক পুরস্কার দান বা সয়তান কর্তৃক দণ্ডদান এ সকলের কোনটাই বিশ্বাস করিত না। ম্যাথুতেও (২২।২৩) আমরা উল্লেখ দেখি : 'সাডুসিজরা যেমন পুনরুত্থান নাই বলিয়া আপত্তি করিত * * তাহাদেরও ঠিক সেই দিনই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে'। ফারিসিজদের অপেক্ষা সাডুসিজরা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প ছিল। তবে ফারিসিজরা ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠে। অপরপক্ষে যীশুখৃষ্টের মহাপ্রয়াণের পর হইতে 'মৃত আত্মারা পুনরুত্থিত হয়, মৃত্যুর পর আত্মারা দণ্ড বা পুরস্কার লাভ করে'—এই ধরনের বিশ্বাসের সংগে সংগে দেবদেবী ও অপদেবতার প্রতি আস্থাও নূতন খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রধান নীতি রূপে পরিণত হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, মৃত্যুর পর আত্মার পুনরুত্থানের ধারণা সর্বপ্রথম পারস্যেই সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে নিউ টেষ্টামেণ্টের পাতায় ঐ ধারণা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং তখন হইতে পাশ্চাত্য জগৎবাসী খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা অধিক পরিমাণে ঐ ধারণা গ্রহণ ও স্বীকার করিয়া আসিতেছে।

জরথুস্ত্রের ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করিত যে, মৃত্যুর পর আত্মা মাত্র তিন রাত্রি ধরিয়া মৃতদেহের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যতক্ষণ না তিন রাত্রি অতীত হইয়া চতুর্থ দিনের প্রভাত কাল উপস্থিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে মৃতদেহ ছাড়িয়া পরলোকে গমন করে না। চতুর্থ দিনের প্রভাতে

পুণ্যাত্মারা স্বর্গলোকে যান এবং পাপাত্মারা নরকে গমন করে। যতদিন না আবার নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হইতেছে অথবা শেষ-বিচারের দিন উপস্থিত হইতেছে ততদিন পাপী আত্মারা নরকেই বাস করে। নূতন বিশ্বসৃষ্টির পর আহ্রীমন বা সয়তানের মৃত্যু হইলে চিরন্তন পাপী আত্মারা পবিত্র হইয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।[১] আহুর্-মজদাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিলঃ 'তাহারা কিরূপে পুনরুত্থান সৃষ্টি করেন?' আহুর্-মজদা উত্তর করিয়াছিলেনঃ 'ইহার উত্তর এই যে, পুনরুত্থানের বিকাশ বা সৃষ্টি অলৌকিকতা বা কোন একটি অপূর্বতার সঙ্গে সংযুক্ত কর্ম বা ফলবিশেষ এবং তাহার পরে সচেতন প্রাণীদিগের নিকট একটি অত্যাশ্চর্য বিকাশ-বিশেষ বলিয়াও মনে হয়। সাক্ষীচৈতন্য ঈশ্বরের রহস্যাবলী ও কার্যপ্রণালী আসলে একটি তুজ্ঞের্য় তত্ত্বের ন্যায় অনুভূত হয়।'[২]

জরথুস্ত্রের ধর্মাবলম্বীরা মৃত আত্মার পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিশ্বাস করে, কিন্তু সে পুনরুত্থান জড়-শরীরের নয়—আত্মার এবং ইহাকেই তাহারা অলৌকিক কার্য বলিয়া মনে করে।

যীশুখৃষ্ট প্রচারিত পুনরুত্থান মতবাদও ঠিক ঐ একই ধরণের অলৌকিক বলা যায়। যদিও যীশুখৃষ্ট নিজে পুনরুত্থান বলিতে কি বুঝায় এবং পুনরুত্থান শরীরের—কি আত্মার এসম্বন্ধে কি বুঝিতেন ও বিশ্বাস করিতেন—এসব কোন কথারই তিনি উল্লেখ

১। 'সেক্রেড বুকস অফ্ দি ইষ্ট্', ১৭প ভাগ পৃঃ ২৭, ৩৪, ৪৬

২। ঐ, পৃঃ ৮০

করেন নাই, তথাপি গস্পেল রচয়িতাগণ যেভাবে ঐ সকলের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহা হইতে বুঝা যায়—যীশুখৃষ্টের শিষ্যেরা বুঝিতেন যে, পুনরুত্থান বলিতে মৃত্যুর পর শরীরের পুনরায় উত্থান হয় আর যীশুখৃষ্টের শরীরেরও তাই পুনরুত্থান হইয়াছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন: মৃত আত্মা স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিয়া তিন দিন মাত্র থাকে এবং এই দিক দিয়া জরথুস্ত্রের মতানুবর্তীদের বিশ্বাসের সংগে যীশুখৃষ্টের শিষ্যদের মতেরও মিল আছে। তাহা ছাড়া মৃত্যুর পর যীশুখৃষ্ট যে অলৌকিক ও আশ্চর্যজনকভাবে তাঁহার শিষ্যদের সম্মুখে স্থূলশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথা সেণ্ট পল্ পরবর্তীকালে বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। কোরিন্থিয়ানদের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে (Epistle to the Corinthians) সেণ্ট পল্ পুনরায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন: সমগ্র খৃষ্টধর্ম যীশুখৃষ্টের অলৌকিকভাবে পুনরুত্থান ও পুনরাবির্ভাবের উপর বিশ্বাস করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তবে সেণ্ট পল্ একথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, যীশুখৃষ্টের পুনরুত্থিত দিব্য জ্যোতির্ময় শরীর রক্তমাংসে গঠিত নশ্বর পূর্বশরীর অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন,[১] কিন্তু দুঃখের বিষয় সেণ্ট পলের এই উক্তিকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করা যায় না এবং তাহার ফলে সেই অস্বীকৃতিপূর্ণ অন্ধবিশ্বাসের পরিণতিও আমরা কতকগুলি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাই। যেমন ঐ প্রকার খৃষ্টানগণ মনে করেন: স্বর্গের দেবদূতদের আহ্বানে মৃত আত্মারা তাহাদের সমাধিস্থান হইতে আবার

১। ১ম কারিন্থিয়ানস্, ১৫

উঠিবে এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অলৌকিক প্রভাবে মৃত শরীরের অস্থি ও মাংসকণাসমূহ নূতন শরীর সৃষ্টি করিবার জন্য আবার একত্রিত হইবে। সেণ্ট পল্ বলিয়াছেনঃ 'কিন্তু এখন মৃত আত্মাদের ভিতর হইতে যীশুখৃষ্ট উঠিতেছেন এবং যাহারা চিরনিদ্রায় এখনও ঘুমাইয়া আছে তাহাদের মধ্যে পুনরুত্থানের আশীর্বাদ একমাত্র তিনিই পাইবেন।' সেণ্ট পল্ প্রচার করিয়াছেন যে, যীশুখৃষ্ট মহানিদ্রিতদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবজন্ম লাভ করিয়াছেন। যাঁহাদের যীশুখৃষ্টের উপর অচল বিশ্বাস আছে তাহারাও যীশুখৃষ্টের ন্যায় মৃত্যুর পর দিব্যদেহ লইয়া সমাধিস্থান হইতে পুনরুত্থিত হইবে, আর যাহারা যীশুখৃষ্টকে অথবা তাঁহার পুনরুত্থান বিশ্বাস করে না, তাহারা মৃত্যুর পর আর উত্থিত হইবে না, চিরনিদ্রার কোলেই শয়ান থাকিবে।'

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে পারসিকরা অলৌকিক-ভাবে পুনরুত্থাননীতি বিশ্বাস করে। সেই অলৌকিকতা যীশু-খৃষ্টের পুনরুত্থান-বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং পরবর্তীকালে সমগ্র খৃষ্টধর্মই যীশুখৃষ্টের ঐ পুনরুত্থাননীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পারসিকরা ও যীশুখৃষ্টের মতানুবর্তীরা পুনরুত্থানকে কোন সার্বভৌমিক নিয়ম বা নীতি বলিয়া স্বীকার করে না; তাহারা ইহাকে কোন দৈবশক্তি হইতে সৃষ্ট অলৌকিকতা বলিয়া মনে করে। তবে এই অলৌকিকতার পশ্চাতে বিজ্ঞান বা যুক্তিসংগত কোন কারণও তাহারা দেখাইতে পারে না।[১]

১। প্রথম কারিন্থিয়াস্, ১৫।২০

আধুনিক বিজ্ঞান অলৌকিকতাকে মোটেই স্বীকার করে না। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত: প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক লোকেরা চিন্তা করিত যে, সমগ্র বিশ্ব অলৌকিক শক্তিবলে পরিচালিত হইতেছে; কিন্তু একথা সত্য নহে। বিশ্বজগতের পশ্চাতে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের একটি ধারা অবশ্যই আছে এবং সে ধারা সর্বদা সুসমঞ্জস, সংগতিসম্পন্ন ও সার্বভৌমিক। এই সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই, সর্বত্র ইহা সমানভাবে আছে। এক্ষণে পুনরুত্থানকে যদি আমরা ঐ সার্বভৌমিক নিয়মের একটি ধারা বলিয়া স্বীকার করি তাহা হইলে একথাও স্বীকার্য যে, যীশুখৃষ্ট জন্মিবার পূর্বেও এ নিয়ম বা নীতি অব্যাহত ছিল, আর সেজন্য সেণ্ট পল যে বলিয়াছেন: 'যীশুখৃষ্ট মৃত আত্মাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবজন্ম লাভ করিয়াছেন'—এ কথাও সত্য হইতে পারে না। অথবা অপরপক্ষে যদি বলা যায়, যীশুখৃষ্টই মৃত লোকদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম নবপ্রাণ লাভ করিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও পুনরুত্থাননীতি কখনও সার্বভৌমিক বা সার্বজনীন এবং সার্বকালিক হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমিক নিয়মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে বৈজ্ঞানিকরা কোন জিনিসকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। কোন কোন অজ্ঞেয়তাবাদী ও জড়বাদী চিন্তাশীল এতদূর পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন যে, যীশুখৃষ্ট কখনই ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া মরেন নাই, কারণ আরিমেথিয়ার (Arimetheia) যোশেফ যখন যীশুর শরীরটিকে ক্রুশ হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন তখন যীশু সম্পূর্ণভাবে অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। তাহার পর যোশেফ যখন পন্টিয়াস পাইলেটের নিকট গমন

করিয়া তাঁহার নিকট যীশুখৃষ্টের দেহটি ফিরাইয়া পাইবার জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিল, পইলেটও তখন সবিস্ময়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যীশু যথার্থই মরিয়াছেন কিনা;[১] কারণ যীশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইবার পর তখন হইতে ছয় ঘণ্টা মাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছে! কোন কোন আধুনিক শারীর বিজ্ঞানবিদেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ক্রুশে বিদ্ধ হইলেও সংযতচিত্ত শক্তিশালী লোকেরা ক্রুশে বিদ্ধ হইবার পরও কয়েকদিন ধরিয়া ক্রুশের উপর বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। এই সকল বিরুদ্ধ মতাবলম্বী অজ্ঞেয়তাবাদী ও নাস্তিকভাবাপন্ন বৈজ্ঞানিকরা বলেন: শীতল পর্বতগুহা রূপ সমাধিস্থানে কয়েক ঘণ্টা থাকিবার পর যীশুখৃষ্ট সমাধিস্থান হইতে বাহিরে চলিয়া আসেন এবং গ্যালিলি গমন করিয়া তাঁহার শিষ্যদের সম্মুখে আবির্ভূত হন।[২] ঘটনা যেমনই হউক না কেন, এখন কিন্তু কেহই বলিতে পারিবে না যথার্থই কি ঘটিয়াছিল; তবে একথা ঠিক যে, বৈজ্ঞানিকরা যুক্তিসংগত প্রামাণিক কোন-কিছুর সন্ধান না পাইলে কোন ঘটনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চান না। কোন পুস্তকে লিখিত আছে অথবা কেহ একজন কোন কথা কখনও বলিয়াছে এই সকল জিনিষের উপর বিশ্বাস করাকে তাঁহারা অপছন্দ করেন। বিশ্ববৈচিত্র্যের প্রত্যেকটি জিনিষ বা ঘটনার পশ্চাতে তাঁহারা

১। ম্যাথু, ১৫।৪৪

২। অধ্যাপক হাক্সলি প্রণীত 'সায়েন্স এ্যাণ্ড ক্রিশ্চান ট্র্যাডিসন্' (*Science and Christian Tradition*), পৃঃ ২৮৯-২৮০

বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ এবং যুক্তিসংগত কারণ ও ব্যাখ্যা না থাকিলে তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে যে সার্বভৌমিক প্রাকৃতিক নিয়ম বা নীতি তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকরা প্রত্যেক অলৌকিক বস্তুর রহস্য ভেদ করিতে সর্বদা উন্মুখ। যদি কোনরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁহারা আবিষ্কার করিতে না পারেন তবে যে সকল ঘটনার পশ্চাতে কেবল মাত্র অলৌকিকতা বা অস্বাভাবিক দৈবশক্তি থাকে তাহাদের প্রত্যেকটিকে তাহারা নিশ্চিতরূপে পরিত্যাগ করেন।

অলৌকিক পুনরুত্থানবাদে এই বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে থাকে যে, জন্মের পূর্বে কোন আত্মার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই মতের অনুবর্তীগণ বিশ্বাস করেন: জন্মের সময়ে সকল আত্মাই শূন্য হইতে সৃষ্টি হয় এবং এই সর্ব-প্রথম তাহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, শূন্য হইতে কোন জিনিস অকস্মাৎ সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পর তাহা একেবারে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে না এবং এই উভয় চিন্তাই অসম্ভব। জড় ও চৈতন্য উভয়ের কোনদিন ধ্বংস নাই। সুতরাং বিজ্ঞান 'সৃষ্টি' বলিতে বিকাশের কথাই সমর্থন করে এবং সেজন্য প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণ রূপে কোন অলৌকিক ও অস্বাভাবিক বস্তু বা শক্তির মধ্যস্থতা তাঁহা মানিতে রাজী নয়।

পুনরুত্থাননীতি আধুনিক বিজ্ঞানের এই সকল চরমসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু অপরপক্ষে পুনর্জন্মবাদ

বর্তমান বিজ্ঞানের আবিস্কৃত সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক সত্য ও নিয়মকে গ্রহণ করিয়া যথাযথ ও যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট প্রকাশ করে। পুনর্জন্মতত্ত্ব সংপূর্ণভাবে বিকাশ বা ক্রমবিকাশনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পুনর্জন্ম বলিতে কোন একটি জীবাণুর নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ এবং তাহার মধ্যে যে সমস্ত শক্তি ও তেজ অব্যক্ত আকারে নিহিত থাকে ধারাবাহিক ভাবে তাহাদেরই পুনঃপ্রকাশ বা পুনরাভিব্যক্তি বুঝায়। ইহা ছাড়া পুনর্জন্মবাদ কার্য-কারণ নিয়মের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই কার্য-কারণনীতি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কারণ কখনও কার্যের বাহিরে থাকিতে পারে না, তাহা সর্বদা কার্যের মধ্যেই অবস্থান করে; সুতরাং কারণ কার্যেরই সুপ্ত বা অব্যক্ত অবস্থা এবং কার্য বলিতে কারণেরই ক্রিয়াশীল ব্যক্ত অবস্থা বুঝায়। আসলে বিশ্বের বাস্তব সত্ত্বারূপ সমুদ্রের উপর একটি মাত্র দিব্য ও অনন্ত শক্তি-ধারা প্রবাহিত এবং সেই অমিত বিরাট শক্তিই অসংখ্য তরংগের আকারে এই সংসার-সমুদ্রের উপর প্রকাশ পাইতেছে। সেই অসংখ্য তরংগেরই একটিকে আমরা বলি অন্যটির কারণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারণ যাহা তাহা ভবিষ্যৎ কার্যের অব্যক্ত বা বীজাবস্থা এবং পূর্ববর্তী অব্যক্ত কারণের কার্যাবস্থা। তবে একথা সত্য যে, সকলের ভিতর একটি মাত্র শক্তি-প্রবাহই সমানভাবে প্রবাহিত আছে।

আত্মা অকস্মাৎ শূন্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার সৃষ্টি এই সর্বপ্রথম—এ রকমের ধারণা পুনর্জন্মতত্ত্ব মোটেই স্বীকার

করে না। পুনর্জন্মনীতি অনুসারে আত্মার অস্তিত্ব অনন্ত অতীতের গর্ভেও ছিল এবং অনন্তকাল ধরিয়া তাহা বর্তমান থাকিবে। যে কোন প্রাণী সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হয় তাহার নিজেরই কৃতকর্ম অনুসারে। কার্য কারণেরই স্বরূপ এবং কার্যের প্রতিক্রিয়া কারণের ফলস্বরূপ। আমাদের বর্তমান জীবন অতীতে কৃত কর্মসমূহের ফলস্বরূপ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন বর্তমান জীবনে কৃতকর্মের ফলরূপে দেখা দেয়। সুতরাং বর্তমান জীবনে কৃত আমরা যে কোন কাজই করিনা কেন, কোনটাই কখনও নষ্ট হইবে না। সুতরাং আপনারা একথা মনে করিবেন না যে, মৃত্যুর সংগে সংগে অকস্মাৎ আমাদের জীবনের সমস্ত চিন্তাশক্তি নিঃশেষিত বা নষ্ট হইয়া যাইবে। না, তাহা একেবারেই অসম্ভব। একটি জীবনের সমগ্র চিন্তাশক্তি মৃত্যুর সংগে সংগে কখনও নষ্ট হয় না, পরন্তু তাহারা একটি কারণকেন্দ্রে অব্যক্ত আকারে সঞ্চিত থাকে, অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশ পাইলে পুনরায় তাহারা ব্যক্ত আকারে প্রকাশ পায়। অতএব প্রত্যেক মানবের আত্মাকে তাহার সমগ্র চিন্তাশক্তির একটি কেন্দ্রমাত্ররূপে বর্ণনা করিতে পারি। এই কেন্দ্রের নাম 'সূক্ষ্মশরীর' বা 'লিঙ্গদেহ'। এই সূক্ষ্ম অথবা অতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য চিন্তাশক্তিকেন্দ্র বিকাশোন্মুখ সুপ্ত শক্তিসমূহকে প্রকাশ করিবার জন্য একটি মধ্যবর্তী জড়বস্তুর সৃষ্টি করে। যতদিন পর্যন্ত না অদৃশ্য আকারে সুপ্ত ও সঞ্চিত শক্তিসমূহ পরিপূর্ণভাবে একটি জীবাণুকে প্রাণবান করিয়া প্রকাশ করে ততদিন এই সৃষ্টি-

প্রবাহ চলিতে থাকে। পুনর্জন্মবাদ জাগতিক নিয়মের সহিত যেরূপ একতাসূত্রে গ্রথিত এবং সেজন্য জাগতিক কোন নিয়মের সংগে তাহার কোনরূপ বিরোধ নাই, মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মের সহিতও সেরূপ তাহার যথেষ্ট যোগসূত্র আছে। পুনর্জন্মবাদ মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল স্তরের নিয়ম-কানুনকে অনুসরণ করিয়া চলে। ইহা ছাড়া কার্য-কারণ নিয়ম যেমন বাহ্য জগতের যাবতীয় বাস্তব বৈচিত্র্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, আন্তর বা অনুভূতির জগতেও তেমন যাবতীয় আন্তর বিকাশকে তাহা নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার উদাহরণ যেমন, মানসিক চেষ্টা বা চিন্তা যদি সৎ হয় তবে তাহার ফলও শুভ হয় এবং চেষ্টা বা চিন্তা অসৎ হইলে তাহার ফলও অশুভ হয়। কারণ প্রত্যেক কার্য তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী ফল সৃষ্টি করে। সৎ বা উৎকৃষ্ট ফল আমরা তাহাকে বলি যাহা সুখ, প্রীতিকর অনুভূতি ও মনে শান্তি আনয়ন করে এবং যাহা দুঃখ-কষ্ট, অপ্রীতিকর অনুভূতি ও দুর্গতি আমাদের অদৃষ্টে আনিয়া দেয় তাহাই অসৎ বা অনিষ্টকর ফল। সুতরাং একথা সত্য যে, পুনর্জন্মনীতি কর্মের এবং তাহার ফলাফলের নির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট স্বাধীন চিন্তার অবসর দান করে। মোটকথা বাসনা, প্রকৃতি ও কর্মের দ্বারা আমরা আমাদের স্বভাব ও ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি করি।

তবে সাধারণভাবে পুনরুত্থানবাদ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার দ্বারা একজন লোক কেন দুষ্ট প্রকৃতির ও আর একজন লোক কেন সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে

এই সমস্যার সমাধান কিছু করিতে পারি না। এই মতবাদ সম্বন্ধে নিজের স্বপক্ষে লুথার নিম্নলিখিত কথাগুলির নজির দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চান। লুথার বলিয়াছিলেন: 'মানুষ একটি ভারবাহী পশু; চালকের আজ্ঞাতে সে পরিচালিত হয়। এই মানুষ-পশুটির উপর কখনও ঈশ্বর এবং কখনও বা সয়তান আরোহণ করেন।' কিন্তু মানুষরূপ ভারবাহী পশুটি যদি ঈশ্বরেরই অধীনে হন তবে ঈশ্বর কেন তাঁহার পশুটির উপর আরোহণ করিবার জন্য সয়তানের হাতে ছাড়িয়া দিবেন না ইহার কোন উত্তর এই পুনরুত্থানবাদ হইতে পাওয়া যায় না। তবে একথা সংগত যে, মানুষ যে সমস্ত দোষ করে সে সকল দোষের জন্য সে সয়তানের হস্তে শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য। তাহা ছাড়া এই মতবাদে বিধিলিপি বা অদৃষ্টের উপর বেশ জোর দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী তাহার কপালে লেখা বা অদৃষ্ট অনুযায়ী স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। অবশ্য মানুষ কেন পাপী বা পুণ্যাত্মা হয় এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য সেণ্ট্ আগাষ্টানিই সর্বপ্রথম খৃষ্টানদের সমাজে অদৃষ্ট ও কৃপাবাদনীতির প্রচলন করেন। অদৃষ্ট ও কৃপাবাদের তাৎপর্য এই যে, করুণাময় ঈশ্বর তাঁহার স্বভাবজাত অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া জন্মের পূর্বেই কাহাকেও অনুগ্রহ করেন এবং সেই লোক যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তখন ঈশ্বরই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে সর্বদা রক্ষা করেন। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক পাপের বোঝা মাথায় লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ

করে। সেজন্য সামান্য কয়েকজন মাত্র মনোনীত লোকই আসলে ভগবানের করুণা লাভ করে এবং অদৃষ্টবশে নরক-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পায়। ইহা ছাড়া এই পুনরুত্থানবাদ হইতে আমরা শিক্ষা করি যে, ঈশ্বর মানুষকে শূন্য হইতে সৃষ্টি করেন, কতকগুলি বিষয়ে তাহাকে নিষেধ করিয়া দেন এবং সেই সংগে তাহাকে এমন কিছু শক্তিও দান করেন যাহাতে সে তাঁহার (ঈশ্বরের) আদেশও যথাযথ পালন করিতে পারে। পরিশেষে দুর্বলতার জন্য ঈশ্বর মানুষকে অনন্ত যন্ত্রনা ও নির্যাতন ভোগ করান। শরীর ও আত্মা কোনদিন পৃথক হইবে না। আত্মা কখনই শরীরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না; কেননা আত্মা যদি মুক্তই হন তবে সকল দুঃখের অবসানও তাহার চিরদিনের জন্য হইবে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা পছন্দ করেন না। মানুষের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা ও শাসন তাহার জন্মের পূর্ব হইতে তাহার অদৃষ্টে নির্ধারিত থাকে, সুতরাং সেণ্ট্‌ আগাষ্টানি প্রচারিত অদৃষ্ট ও কৃপাবাদ মনুষ্য-জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান না করিয়া বরং মানুষের মনে দারুণ বিভীষিকা ও ভয়ের সঞ্চারই করে।

কিন্তু পুনর্জন্মবাদ হইতে যে শিক্ষা আমরা পাই আগাষ্টানির শিক্ষা হইতে তাহা পৃথক ও উন্নত। পুনর্জন্মবাদে সমস্ত প্রাণীর নিম্ন হইতে উচ্চ স্তরে বিকাশ বা ক্রমোন্নতি স্বীকৃত হয় এবং যতদিন না প্রাণীরা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা রূপ মুক্তি লাভ করিতেছে ততদিন ক্রমবিকাশ তাহাদের চলিতে থাকে। এই মতবাদের

আশাপ্রদ শিক্ষা এই যে, প্রত্যেক মানুষ এই বর্ত্তমান জীবনে হউক বা অন্য কোন ভবিষ্যৎ জীবনে হউক যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ বা পরমেশ্বরের ন্যায় পরিপূর্ণ জীবন লাভ করিয়া নিজেদের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ অবশ্যই করিবে। তবে পরিপূর্ণতা বা মুক্তি লাভ করিতে যতখানি শক্তির বিকাশ সাধন করিতে হয় তাহার তুলনায় একটি মাত্র জীবনের পরিসর অতীব ক্ষুদ্র। যেমন, যদি তোমরা শিক্ষা দান করিয়া একটি অতি নির্বোধ বালককে শ্রেষ্ঠ একজন শিল্পী বা দার্শনিকে পরিণত করিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে তাহার একটি মাত্র জীবনে তোমাদের প্রচেষ্টা ফলবতী হইবে কিনা সন্দেহ। তাহার পর একটি মাত্র জীবনে সে অতি নির্বোধ হইতে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বা দার্শনিক হইতে পারিল না বলিয়া কি তোমরা তাহাকে শাস্তি দিবে? তা কেন? এতটুকু সাধারণ জ্ঞান যাহার আছে সে কাহাকেও কখনও এরূপ অন্যায় শাস্তি দিতে পারে না। ঠিক সেরূপ কোন লোক যদি তাহার জীবদ্দশায় পরিপূর্ণ জীবন লাভ করিতে না পারে তাহার জন্য ঈশ্বর কি তাহাকে শাস্তি দান করিবেন? এখানে আমরা যদি একথা বলি যে, ঈশ্বর আমাদিগকে সদসৎ বাছিয়া লইবার জন্য স্বাধীন চিন্তা দিয়াছেন এবং আমরা সেই নির্বাচনের জন্য সংপূর্ণ দায়ী, সুতরাং অন্যায় নির্বাচন করিলে আমরা শাস্তি ভোগ করিব, তাহা হইলে বলিব এরূপ বিচার করা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে। যাহারা এরূপ যুক্তির মোহে অভিভূত হয় তাহারা একথা ভুলিয়া যায় যে, ঈশ্বর প্রাণীদের অন্যায়ের

পথে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার প্রবল পরাক্রান্ত সয়তানকেও সুযোগ ও প্ররোচনা দান করেন।

এই কথাগুলিতে কিন্তু পুরাতন একটি গল্পের কথা আমার মনে পড়িতেছে। এক সময়ে কোন একটি দেশে এক নির্দয় ও প্রজাপীড়ক রাজার অনুগ্রহে একজন বন্দীকে মুক্তি দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই প্রজাপীড়ক রাজা বন্দীকে বলিয়াছিল: 'দেখ হে দুর্বিনীত, আমি তোমায় মুক্ত করিয়া স্বাধীনতা দিতেছি, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার। কিন্তু একটি মাত্র সর্ত তোমার জন্য আছে: যদি তোমায় কোন বন্য জন্তু আক্রমণ করে, তাহা হইলে তোমাকে একটি অন্ধকূপে আবদ্ধ রাখা হইবে এবং সেখানে তোমার যন্ত্রণার আর অন্ত থাকিবে না।' এই কথা বলিয়া রাজা বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু সংগে সংগে একটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকেও সেই বন্দীর পশ্চাতে ছাড়িয়া দিবার জন্য ভৃত্যদের আদেশ দিলেন। এই কার্যকে কি আমরা অনুগ্রহ বলিব?

পুনর্জন্মবাদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রত্যেক প্রাণী বা আত্মা স্বরূপতঃ পবিত্র ও মুক্ত। সে ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে তাহার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে পুনরায় কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। প্রত্যেকটি বিকাশের মধ্যে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করে, তবে সেই অনুভূতি অধিক কাল স্থায়ী হয় না। সুতরাং একথা ঠিক যে, আমাদের ভাল বা মন্দের

জন্য ঈশ্বর অথবা সয়তান কেহই দায়ী নন। ভাল ও মন্দ, সৎ ও অসৎ-কে সমুদ্রে তরংগের উত্থান ও পতনের সংগে তুলনা করা যায়। সমুদ্রের বক্ষে যখন তরংগ উত্থিত হয় তখন উত্থানের সংগে সংগে কোথাও না কোথাও নিম্ন অনুন্নত স্থানও সৃষ্টি হয়। সুতরাং অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রে অসংখ্য এরূপ তরংগ উঠিতেছে, পুনরায় পড়িতেছে। উন্নত তরংগগুলিই সৎ এবং তাহাদের পার্শ্বে অনুন্নতগুলি অসৎ বা দুঃখ-কষ্ট। আসলে প্রত্যেকটি প্রাণীর জীবন-প্রবাহ সেই চরম লক্ষ্যরূপ পরিপূর্ণতা বা মুক্তির দিকে ক্রমাগত ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কে বলিতে পারে সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে কতদিন সময় লাগিবে? তবে যে কেহ এই জীবনেই মুক্তির অমোঘ আশীর্বাদকে বরণ করিতে পারিবে তাহাকে আর কখনও জন্ম-মরণপ্রবাহে পতিত হইতে হইবে না, জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত স্রোতকে সে চিরদিনের জন্য অতিক্রম করে। কিন্তু মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত প্রত্যেককে আবার শরীর ধারণ করিতেই হইবে।

অনেকে এ কথা চিন্তা করেন যে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার পর প্রত্যেক প্রাণী প্রথম হইতে আবার তাহার জীবনের গতি আরম্ভ করে কিনা। এ বিষয়ের সুমীমাংসা পুনর্জন্মবাদ হইতে পাওয়া যায় না। তবে একথাও ঠিক নহে। পুনর্জন্মবাদ হইতে বরং আমরা জানিতে পারি : প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর পূর্বে যেখানে তাহার কর্ম ও জীবনের প্রবাহ শেষ হইয়াছে পরজীবনে ঠিক সেখান হইতে আবার সেগুলিকে আরম্ভ করে আর সেই ধারাবাহিক

বিকাশের গতিও সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকে। পুনর্জন্মবাদ হইতে ইহাও আমরা জানিতে পারি যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনরায় পশুশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করে না, কেননা প্রত্যেক মানুষ বা প্রাণী তাহার নিজের নিজের প্রবৃত্তি, বাসনা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শরীর ধারণ করে। বাসনা ও প্রবৃত্তিই শরীর-ধারণের একমাত্র কারণ। সুতরাং যদি কোন লোক ইচ্ছা করে যে, মৃত্যুর পরে পৃথিবী বা অন্য লোকে সে আর জন্মগ্রহণ করিবে না, নির্দিষ্ট কোন সুখের বস্তু উপভোগ করিবে না, এবং সত্যই যদি সে স্বার্থপরতা ও কামনার পঙ্কিলতা হইতে চির-নির্মুক্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই কখনও সে আর পৃথিবীতে শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিবে না। প্রকৃতপক্ষে পুনর্জন্মনীতির স্বপক্ষে যুক্তিযুক্ত ও সন্তোষজনক প্রমাণ যথেষ্ট আছে। সুতরাং পুনর্জন্মবাদের পশ্চাতে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নাই, কিম্বা জন্ম ও মৃত্যুর যুক্তিসংগত কোন কারণ ইহা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অপরপক্ষে পুনর্জন্মবাদ মনুষ্য-জীবনের সকল সমস্যা সমাধান করে এবং মানুষের মনে যত প্রকার প্রশ্ন ও সন্দেহের অবকাশ থাকে সে সকলের বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মীমাংসা করে। সেজন্য বলিতে হয়: "যাহারা নির্বোধ বালকের মত সর্বদা ঐশ্বর্য ও নাম-যশের মোহে মুগ্ধ থাকে তাহারা কখনই পুনর্জন্ম-রহস্যের সমাধান করিতে পারে না; আর সেজন্য তাহারা ভাবে যে, মৃত্যুর সংগে সংগে মনুষ্য-জীবনের সকল-কিছুরই অবসান হয় এবং সেজন্য জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে পড়িয়া তাহারা পুনঃপুনঃ যাতায়াতও করিতে থাকে।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেহান্তরবাদঃ

জীবন-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করিয়া মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা ইহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত মতবাদের মধ্যে যতগুলি প্রাচ্যবাসীরা মানিয়া আসিতেছেন দেহান্তরতত্ত্ব তাহাদিগের অন্যতম। এই মতবাদ হইতে প্রমাণ হয় যে, জড়শরীর ধ্বংস হইয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া গেলেও নিত্যসত্ত্বা হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব অনন্তকাল থাকিয়া যায়। সুতরাং যাহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, জড়শরীর হইতে সংপূর্ণ পৃথক কর্তা ও জ্ঞাতা হিসাবে সর্বজ্ঞানসম্পন্ন আত্মাকে মানিতে চায় না, তাহারা অপরিহার্যরূপে দেহান্তরবাদ অস্বীকার করে বুঝিতে হইবে। অবশ্য সর্বযুগে জড়বাদী মনীষীরা এই মতবাদ গ্রহণে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, কেননা তাঁহারা জড়শরীর হইতে ভিন্ন কর্তা, মন্তা ও জ্ঞাতারূপে স্বয়ংবেদ্য আত্মার পৃথক একটি অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চান না এবং তাহার ফলে আত্মা যথার্থপক্ষে মৃত্যুর পর থাকেন কি-না, আত্মার অস্তিত্বের কোন প্রকার নাশ হয় কিনা এ সব জটিল প্রশ্নের কোন আলোচনাও তাঁহারা করেন না। এই ধরণের জড়বাদী মনীষীদের বিংশ শতাব্দীতেই যে কেবল দেখা যায় তাহা নহে, ইঁহারা সর্বযুগে সকল দেশেই ছিলেন। বর্তমানে অজ্ঞেয়তাবাদী ও জড়বাদী

বৈজ্ঞানিকদের নিকট হইতে যেমন আমরা শুনি, প্রাচীনকালে কি ভারতবর্ষে—কি অন্যান্য সুসভ্য দেশে সর্বত্রই জড়-সর্বস্ববাদী চিন্তাশীলগণের নিকট হইতেও ঠিক অনুরূপ মতবাদ তর্ক এবং যুক্তির আমরা প্রতিধ্বনি পাই। কিন্তু তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক সম্পূর্ণ একঘেয়ে ও আদৌ সন্তোষজনক নয়। তাঁহারা জড়সমষ্টি বা জড়শক্তি হইতে আত্মচৈতন্যের উৎপত্তি স্বীকার করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই স্বীকৃতির বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণ তাঁহারা দিতে পারেন না। তাহা ছাড়া বস্তু হিসাবে আত্মার যে অস্তিত্ব আছে সে সম্বন্ধে কোন যুক্তি-তর্কই তাঁহাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। কাজেই আত্মাকে যদি টানিয়া হিচ্‌ড়াইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে নামাইয়া আনিতে পারা যায় তখনই জড়বাদীদের তাহা সংপূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় এবং তখনই তাঁহারা সেই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আত্মা-বস্তুটিকে লইয়া গবেষণা ও অনুশীলন করিয়া তবেই আত্মা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, অন্যথা নয়। কিন্তু আত্মাকে স্থূল ইন্দ্রিয়ের জগতে টানিয়া আনাই বা কিরূপে সম্ভব? আত্মা বায়বীয় ও অতীব সূক্ষ্ম পদার্থ, তাঁহাকে কখনই স্থূল চক্ষের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

পুনরায় যাহারা বংশ-পারম্পর্যরূপ নীতির দ্বারা আমাদের জাগতিক জীবনের কারণ ও সমস্যা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা দেহান্তরবাদ বিশ্বাস করিতে চান না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণ, অজ্ঞেয়তাবাদীরা ও জড়বাদীরা এই বংশপারম্পর্য-নীতি

সাধারণতঃ স্বীকার করেন এবং তাহার দ্বারা জগতের সমস্ত-কিছুকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাস্তবিক যদি বিচক্ষণতার সহিত তাঁহাদের স্বীকৃত বংশপারম্পর্য-নীতি পরীক্ষা করি তাহা হইলে দেখিব ঐ নীতি অপেক্ষা লোকান্তরবাদ অনেকাংশে সন্তোষজনক ও যুক্তিযুক্ত।

জগতে শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির অনুষ্ঠাতাদের ভিতর খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান ও পারসিকদের বেশীর ভাগ লোকই লোকান্তরবাদের সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী নন। অবশ্য এমন এক সময় ছিল যখন খৃষ্টানগণ এই মতবাদকে বিশ্বাস করিতেন। জাষ্টিনিয়ানের পূর্ব পর্যন্ত অরিগেন ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা লোকান্তরবাদ স্বীকার করিতেন, কারণ যাহারা পুনর্জন্মবাদ বা আত্মার পূর্বজন্মাস্তিত্ব স্বীকার করিত জাষ্টিনিয়ান তাহাদিগকে ঈশ্বরের অভিশপ্ত লোক বলিয়া ধর্মসমাজ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতেন। ইহুদীদের ভিতরেও দেখা যায়ঃ কাবালায় বা তাহাদের তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে এই লোকান্তরবাদের ধারণা একটি প্রধান অংশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। মোটকথা ইহুদীদের তান্ত্রিক সম্প্রদায় অন্যান্য মতবাদের সাহায্যে কোন সমস্যার সমাধান করিতে যখনই অপারগ হইতেন তখনই তাঁহারা এই দেহান্তর বা জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিতেন এবং সে দিক দিয়া দেহান্তরবাদকেও তাঁহারা কোন রকমে সমর্থন করিতেন ; কিন্তু যে সকল ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান ও পারসিক দেহান্তরবাদ স্বীকার করিতেন না তাঁহারা 'একজন্মবাদ' (one-brith theory) স্বীকার করিতেন ; অর্থাৎ তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহাদের ঈশ্বর

প্রাণীদের জন্মের সময়ে শূন্য হইতে আত্মা সৃষ্টি করিলেন এবং এই সকল আত্মা শূন্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্তকাল জীবিত থাকে। অর্থাৎ মনুষ্যগণ পৃথিবীতে আসিয়া সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পূর্বে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল না, ঈশ্বর অকস্মাৎ শূন্য হইতে তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মৃত্যুর পরে তাহারা প্রত্যেকে আবার হয় স্বর্গে বাস করিয়া অনন্তকাল সুখ-ভোগ করিবে—নয় নরকে পচিয়া অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা লাভ করিবে। আধুনিক অধ্যাত্মবাদী বা প্রেততাত্ত্বিকদের ভিতর আমরা দেখিয়াছি—যাঁহারা একজন্মবাদের ধারণা লইয়া জন্মিয়াছেন ও সর্বদা সেই ধারণার পরিবেশে লালিতপালিত হইয়াছেন, তাঁহারা দেহান্তর-নীতিকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাহা হইলেও পৃথিবীর সর্বত্র এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছেন যাঁহারা দেহান্তর প্রাপ্তি ও লোকান্তরবাদ বিশ্বাস করেন। ইহার দ্বারা তাঁহারা জীবনে সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করিয়া জীবন-মৃত্যু সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিয়াছেন।

আত্মার দেহান্তর পরিগ্রহনীতিকে অধিকাংশ দার্শনিক লোকান্তর বা পুনর্জন্মবাদ বলেন। এই মতবাদের প্রকৃত অর্থ এই যে, আমাদের আত্মা মত্যুর পর একটি শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটি শরীরকে আশ্রয় করে; অথবা বলা যায়, কোন একটি শরীরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাস করিয়া মৃত্যুর সময়ে আত্মা তাহা পরিত্যাগ করে এবং আরও অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য মনুষ্য, জন্তু বা দেবতা এই বিভিন্ন শরীর পুনরায় ধারণ করে। মানবের আত্মা মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া কোন দিব্যশরীর আশ্রয় করিতে পারে ও তাহার পর আবার মনুষ্য-শরীরে অথবা অন্য কোন জীব-

জন্তুর স্তরে নামিয়া আসিয়া নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং দেহান্তর বা পুনর্জন্মবাদের প্রকৃত অর্থ এই যে, প্রাণীদের আত্মা জন্তু, মনুষ্য বা দিব্য যে কোন শরীর হইতে শরীরান্তরে গমনাগমন করে। এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমনাগমন করে যে পদার্থ তাহার পরিমাণ ও গুণের কোন পরিবর্তন হয় না, তাহা বরাবর একই রকমের থাকে। সে পদার্থটি তাহার রুচি, প্রবৃত্তি ও প্রাকৃতিক ভাব অনুযায়ী এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ নির্বাচন করে। এই ধারণা প্রাচীন ইজিপ্টবাসীদের ভিতরে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, মনুষ্য বা যে কোন প্রাণীর আত্মা জীবনের বিভিন্ন স্তরের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার জন্য সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া একটি শরীর পরিত্যাগ করিয়া তাহার পর আর একটি শরীর এইরূপে অসংখ্য শরীরধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিত।

গ্রীক দার্শনিকদের ভিতর পাইথাগোরাস, প্লেটো ও তাঁহাদের অনুবর্তীরা আত্মার পরদেহে আশ্রয় ও পরলোকগমনতত্ত্ব বিশ্বাস করিতেন। পাইথাগোরাস বলিয়াছেন: "প্রজ্ঞাবান আত্মার মৃত্যু হইলে সে পার্থিব দেহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া বায়বীয় শরীর ধারণ করে এবং যতদিন না পুনরায় কোন মনুষ্য বা পশু-শরীরকে আশ্রয় করে ততদিন পর্যন্ত সেই বায়বীয় শরীরে মৃতাত্মাদের রাজ্যে সে অপেক্ষা করে। শুভ কর্মের সাধন দ্বারা ধারাবাহিক-ভাবে দেহান্তর-গমনে বিশেষভাবে পবিত্র হইলে তাহারা দিব্যাত্মাদের মধ্যে আসন লাভ করে এবং যে পবিত্র ব্রহ্মচৈতন্য হইতে সে প্রথমে আসিয়াছিল সেখানে পুনরায় ফিরিয়া যায়;

অর্থাৎ সমস্ত বাসনা-বিবর্জিত হইয়া সে শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।”

প্লেটোও এই দেহান্তরবাদ বা পুনর্জন্মনীতিকে বিশ্বাস করিতেন। অবশ্য এই ধারণা পাইথাগোরাস ও প্লেটো কোন্ সময় হইতে যে লাভ করিয়াছিলেন তাহা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন ইহারা ইজিপ্ট হইতে এই ধারণা পাইয়াছিলেন। অনেকের অভিমত যে, পুনর্জন্মবাদ বা দেহান্তরের ধারণা প্রত্যক্ষভাবে হউক বা পরোক্ষভাবে হউক ভারতবর্ষ হইতে ইহারা লাভ করিয়াছিলেন। মৃত আত্মারা কেন ও কেমন করিয়া মনুষ্য অথবা পশুশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার বিবরণ গল্পের ভাষায় প্লেটো তাঁহার ‘ফিউড্রাস’ পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ “স্বর্গে জিউস্ স্বর্গস্থ পিতা ও সর্বপ্রাণীর নিয়ন্তা ঈশ্বর সমস্ত জীব ও পদার্থকে নিয়মন ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাঁহার পক্ষযুক্ত রথ পরিচালনা করেন। বহু দেব-দেবী ও মৃত ব্যক্তিদের আত্মারাও যে যাঁহার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করেন। অবশ্য যে কেহই স্বর্গস্থ পিতা বা জিউসের অনুগমন করিতে পারেন। চতুর্দিক পরিভ্রমণ করিবার পর তাঁহারা স্বর্গীয় প্রকোষ্ঠের পরিবেষ্টনীর মধ্যে অত্যন্ত ঋজু বা খাড়া-ভাবে অগ্রসর হইলেন এবং একটি ভোজনোৎসবের উপলক্ষে সম্মিলিত হইলেনা দেবতাদের রথ সংযত ও সুপরিচালিত হওয়ায় অতি সহজে তাহা অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু অপর সকলের পক্ষে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। সারথি যতক্ষণ না রথকে নিজের আয়ত্তে আনিয়াছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত দুষ্ট অশ্বের

জন্য ও সাধারণত পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া থাকার নিমিত্ত রথ ভারে নত হইয়া যায় এবং তাহার জন্য মৃত আত্মাদের সকলকে অত্যন্ত পরিশ্রান্তি ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। দেবতাদের আত্মা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, বাহিরে সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং স্বর্গের পবিত্র পৃষ্ঠভূমির উপর দাঁড়াইয়া অনন্ত দিব্যশান্তি উপভোগ করেন। পবিত্রাত্মা দেবতাদের জীবনের বৈশিষ্ট্যই এই। অপরাপর আত্মা যাহারা ঈশ্বরের অনুগামী হইয়াছিলেন ও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, তাঁহারাও সত্যের কল্যাণময় রূপ দর্শন করিয়াছিল এবং বহির্জগতের পরিবেশের মধ্যে অতীব কষ্টের সঙ্গে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। অবশিষ্ট আত্মারা উন্নত লোকের (ভূমির) অভিলাষী হইয়া ঈশ্বরকেই অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে সমর্থ না হওয়ায় কে প্রথমে উন্নত লোকে প্রবেশ করিবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পর নিক্ষিপ্ত ও নিষ্পেষিত হইয়া অবশেষে নিম্নাভিমুখী হইয়াছিল এবং সেখানে অশেষ বিশৃঙ্খলা ও নিদারুণ কষ্টের মধ্যে পড়িয়া অনেকের পদ ও পক্ষ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সুতরাং আত্মারা যখন ঈশ্বরকে অনুসরণ করিতে না পারিয়া সত্যের আলোক দেখিতে পায় না তখনই তাহারা অবহেলা ও পাপ এই দুইটির ভারে পঙ্কিল ও নিষ্পেষিত হইয়া অন্ধকূপগর্ভে নিমজ্জিত হয়, তাহাদের ডানার পালক খসিয়া যায়, নিম্নে পৃথিবীলোকে তাহারা নামিয়া আসে এবং মনুষ্য বা পশুরূপে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে থাকে।” প্লেটোও বলিয়াছেন: “যে কোন আত্মা স্বরূপে

ফিরিয়া যাইতে অন্তত দশ সহস্র বৎসর লাগে, কেননা তাহার পূর্বে তাহার পক্ষ কখনই জন্মাইতে পারে না।” “তবে প্রথম সহস্র বৎসর শেষ হইলে পুণ্যশীল ও পাপী এই উভয় আত্মাই একসংগে তাহাদের ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হয় এবং তাহাদের যে যাহার প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির ভাব অনুযায়ী নিজ নিজ শরীর নির্বাচন করে। অবশ্য যেরকম ইচ্ছা সেরকম তাহারা শরীর নির্বাচন করিতে পারে।” পূর্ব-পূর্ব জীবন বা জন্মের ভাল-মন্দ কর্মের ফল গ্রহণ না করিয়াও মৃত আত্মারা যে যাহার জ্ঞান ও স্বভাবের প্রকৃতি অনুযায়ী নিজের নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করিতে পারে। “কোন কোন আত্মা মনুষ্য-দেহে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সিংহ ও ঈগল প্রভৃতি পশু-পক্ষী রূপে জন্মগ্রহণ করিতে পছন্দ করে। অপরে তাহাদের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য মনুষ্য-শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করে।” এক্ষণে এই আখ্যানমূলক বর্ণনা হইতে প্লেটো যে দেহান্তরনীতি বিশ্বাস করিতেন একথাই আমরা জানিতে পারি।

কিন্তু দেহান্তরপ্রাপ্তি অথবা জীবাত্মার পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে আগমন সম্বন্ধে প্লেটোর এই ধারণা ও বিশ্বাস বর্তমানে বহু চিন্তাশীল মনীষী সমালোচনা করিয়াছেন। প্লেটোর এই ধারণাকে উপলক্ষ্য করিয়া ‘লণ্ডন সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি’-র সদস্য ডাঃ মায়ার্স তাঁহার “হিউম্যান্ পার্সোনালিটি” নামক বিখ্যাত পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে লিখিয়াছেন: “সহজ সরল কথা বলিতে গেলে প্লেটো ও ভার্জিলের সম্ভবত ইহাই অভিমত যে, পৃথিবীতে তীক্ষ্ণ যুক্তি অথবা মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি তথা

বিবেকের কোন-কিছুই বিরুদ্ধে বা বিপরীতধর্মী নহে ; কিংবা বিকাশের এরূপ বিভিন্ন অবস্থায় মরণশীল মানুষের ছদ্মবেশে যে সকল বিদেহী আত্মা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তাহাদের 'প্রত্যক্ষ সৃষ্টির নীতি' (theory of the *direct creation*) সম্বন্ধে অনুধাবন করাও বিশেষ সহজ নয়। কিন্তু ইহা সকলে আবার অনুভব করে যে, বিদেহী আত্মাদের পুনঃপুনঃ দেহান্তর গ্রহণের মধ্যে এক প্রকার নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্র বা পূর্বসম্বন্ধের একটি আভাস অবশ্যই থাকে।"[১]

সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যায়ঃ কেন ঈশ্বর সকল আত্মাকে ঠিক সমানভাবে সৃষ্টি করেন নাই? কেনই বা একটি আত্মা আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিল, আর একটি আত্মা সংপূর্ণরূপে অজ্ঞ ও নির্বুদ্ধি হইয়া জন্মগ্রহণ করিল? আসলে 'বিশেষ-সৃষ্টিবাদ' (special creation theory)-এর দ্বারা এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যাইবে না, অথবা এ সমস্যার কোন-কিছু সমাধান হইবে না। সেইজন্য ডাঃ মায়ার্স বলিয়াছেনঃ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রত্যেক আত্মার বর্তমান জন্মের সহিত অতীত জন্মের একটি নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ অর্থাৎ অভিন্ন যোগসূত্র আছে। ডাঃ মায়ার্সের এই কথা হইতেও বোঝা যায় যে, তিনি প্রত্যক্ষ-ভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে দেহান্তরবাদ সমর্থন করিতেন।

যদিও আত্মার পূর্বাস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি নির্দিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক

১। ডাঃ মায়ার্স প্রণীত "হিউম্যান্ পার্সোনালিটি", (*Human Personality*), ২য় ভাগ, পৃঃ ১৩৪

কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই, তাহা হইলেও পুরোপুরি-ভাবে তিনি এ সত্যকে অস্বীকার করেন নাই। কেননা তিনি বলিয়াছেন : "সৃষ্টির আদি হইতে অথবা ক্ষুদ্র জীবাণুর উৎপত্তি হইতে উন্নততর মানব-বুদ্ধির বিকাশ-কাল পর্যন্ত যে শক্তি আমাদের দেহ ও মনকে গঠন ও পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহা জড় নয়, পরন্তু চৈতন্যবিশিষ্ট।" "প্রাচীন দেহান্তরবাদিগণের অভিমতের মধ্যেও কিছু-না-কিছু সত্য আছে। মানুষও প্রকৃতপক্ষে কেবলই পিতা ও মাতার বংশানুক্রমিকতার ফলবিশেষ নয়, গ্রহ ও জাগতিক পরিবেশের প্রভাবও তাহার উপরে আছে।[১]"

দেহান্তরবাদ সম্বন্ধে প্লেটো যেভাবে যুক্তি-বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, প্লেটোর বহুপূর্ব হইতে ভারতবর্ষে সেই সব যুক্তি, বিচার ও প্রমাণের অভাব ছিল না। আমরা দেখিয়াছি—প্লেটো দেহান্তরবাদ সম্বন্ধে যেরূপ যুক্তিপ্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে জন্মগ্রহণকামী প্রত্যেক বিদেহী আত্মা যে যাহার জ্ঞান ও স্বভাব অনুযায়ী নিজের ভাগ্য নির্ণয় করিতে পারে এবং সেজন্য সে ভাল-মন্দ কৃতকর্মের ফলের জন্য মোটেই দায়ী হয় না। তবে কোন্ নিয়মের বশবর্তী হইয়া বিদেহী আত্মা তাহার ভাগ্য নির্ণয় করে সে সম্বন্ধে প্লেটো আবার কোন কথাই বলেন নাই। প্রাচীন ভারতের চিন্তাশীল মনীষী ও দার্শনিকেরা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন : প্রত্যেক বিদেহী আত্মা যে যাহার পূর্ব-পূর্ব ভাল ও মন্দ কর্মের

---

১ মায়ার্স প্রণীত "হিউম্যান পার্সোন্যালিটি" (*Human Personality*), ২য় ভাগ, পৃঃ ২৬৭

সাধারণ ফল অনুযায়ী দেহ ধারণ করে; সুতরাং এই পার্থিব শরীর-ধারণে যে যাহার স্বভাব অনুযায়ী কোন স্বাধীন নির্বাচনের স্থান নাই। প্রাচীন ভারতে শ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিকেরা কার্য-কারণরূপ সার্বভৌমিক একটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। সংস্কৃতে তাহাকে 'কর্ম' বা 'কর্মফল' বলে। কর্ম বা কর্ম-ফলের অর্থ কার্য থাকিলে তাহার একটি কারণ থাকিবে বা কর্ম করিলে তাহার একটি পরিণতিরূপ ফল আছে। কর্মের ফল সর্বদা কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী হয়। যে ধরণের কর্ম হইবে, তাহার ফলও তদনুযায়ী হইবে; অর্থাৎ ফল অনুযায়ী তাহার কর্ম হয়, কেননা কর্ম ও তাহার ফল সমপ্রাকৃতিক। সুতরাং কার্য ও কারণ—কর্ম ও তাহার ফলের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য ও মিলন-মৈত্রীর ভাব সর্বদাই থাকে। বর্তমান বিজ্ঞানের জগতেও কর্মসূত্র বা কার্য-কারণবাদ একটি প্রধান ও অপরিহার্য নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুনরায় এই একই নীতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন লোকে কখনও ইহাকে বলে কারণ-শৃঙ্খলা, কখনও পরিপূরক নীতি, কখনও প্রতিকারক নীতি, কখনও বা কার্য-কারণ-নিয়ম। মোটকথা অভিধানে বা নামে তাহারা ভিন্ন হইলেও সকলে এক প্রকার অর্থ প্রকাশ করে; অর্থাৎ প্রত্যেক কারণ তাহার অনুযায়ী কার্য এবং প্রত্যেক কার্যই তাহার সমপ্রাকৃতিক ফল উৎপন্ন করে।

ভারতীয় চিন্তাশীল মনীষীরা এই কার্য-কারণনীতির সাহায্যে মানবাত্মার ভাগ্য নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন এবং এই নীতির সহায়তা লইয়াই তাঁহারা দেহান্তর-রহস্যের সমাধান করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন : মানুষ কখনও এই অপরিহার্য নীতিকে অতিক্রম করিতে পারে না ; প্রত্যেকের চিন্তা ও কর্ম কারণ-রূপে তাহাদের সমপ্রকৃতির ফল উৎপন্ন করে। সুতরাং কাহারও ভবিষ্যৎ কখনও খামখেয়ালী ও ইচ্ছামত স্বাধীন নির্বাচনী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, পরন্তু মানব ও প্রাণীমাত্রেই পূর্বজীবনের চিন্তা এবং ভাল ও মন্দ কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। প্লেটোর মতে মানুষের বিদেহী আত্মা তাহার পছন্দ মতো শরীর ধারণ করে ; অর্থাৎ শরীর ধারণ বিষয়ে তাহার স্বাধীন নির্বাচনী নীতি থাকে এবং সেজন্য ইচ্ছা করিলে সে পশুশরীরও ধারণ করিতে পারে। হিন্দুদের মতে দেহান্তরবাদের নীতি ঠিক স্বাধীন নির্বাচনের পরিণতি নয়, অথবা ইচ্ছা করিলেই মনুষ্য-দেহ ধারণের পর সে পশুশরীর গ্রহণ করিতে পারে না। পরন্তু পূর্বজীবনে কৃত চিন্তা ও কর্ম যদি যে কোন শরীর ধারণ করিবার জন্য নিয়ন্ত্রণ করে তাহা হইলেই কার্য-কারণ-নিয়ম বা কর্মফলের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া আমাদের বিদেহী আত্মা নূতন শরীর ধারণ করিতে পারে। কার্য-কারণনীতিই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবাত্মাদের ক্রমবিকাশের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রকৃতপক্ষে দেহান্তর সম্বন্ধে ভারতীয় মতবাদ প্লেটোর ও ইজিপ্টবাসীদের মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্লেটো ও ইজিপ্টবাসীরা বিশ্বাস করিতেন : প্রাণীদের আত্মা একটি শরীর পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষমান যে কোন প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে। হিন্দুরা কিন্তু এই মতবাদ স্বীকার করেন

না। তাঁহাদের মতে বিদেহী আত্মা অপেক্ষমান যে কোন প্রাণী-শরীরকে আশ্রয় করে না, পরন্তু ক্রমবিকাশনীতি, বাসনা ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী অন্য কোন পার্থিব শরীরকে সে আশ্রয় করে। জীবাণু বা প্রাণবীজ যেমন অনুকোষময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ, বৃদ্ধি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংমিশ্রণ দ্বারা জড়শরীর ধারণ করে, তেমনি মানবাত্মা জাগতিক কার্য-কারণ-নীতির বশে পার্থিক শরীর সৃষ্টি করে। পিতা-মাতারা বিদেহী আত্মাদের শরীর ধারণ করার উপায় মাত্র। তাঁহারা আত্মাকে সৃষ্টি করিতে পারেন না। বিদেহী আত্মারা অনুকূল পরিবেশের মধ্যে যাহাতে জড় পার্থিব শরীর ধারণ করিতে পাবে তাহারই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার পিতা-মাতারা উপলক্ষ্য মাত্র। মানবাত্মারা তাহাদের পূর্ব-পূর্ব জীবনের বাসনা ও প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মানবাত্মারা প্রকৃতপক্ষে প্রাণ বা প্রাণবীজের পরিণতি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আত্মারূপ বীজাণুগুলিতে প্রাণশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, আন্তর মনোশক্তি বা বায়বীয় জড়কণা প্রভৃতি নিহিত থাকে। মৃত্যুর সময়ে আত্মা ঐ সমস্ত শক্তিগুলিকে নিজের সূক্ষ্ম-শরীরে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জড়শরীর পরিত্যাগ করে। মৃত্যুর পরেও শক্তিগুলি বিদেহী আত্মাকে ত্যাগ করে না। শক্তিসংরক্ষণ রূপ নিয়ম-শৃঙ্খলার বশবর্তী হইয়া ঐ শক্তিগুলি সূক্ষ্মদেহী আত্মার মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং অনুকূল পরিবেশ পাইলে তাহারা পুনরায় বিকশিত হয়। পুনর্জন্মের অর্থই তাই যে,

যে সমস্ত শক্তি প্রাণীর বিদেহী আত্মা বা সূক্ষ্মদেহে সুপ্ত অবস্থায় থাকে তাহাদের পুনর্বিকশিত করিয়া তোলা। সূক্ষ্মদেহী প্রাণবীজগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। লিবনিজ ইহাদিগকে বলিয়াছেন 'মনাড' বা অণু, বৈজ্ঞানিকরা বলেন প্রাণবজীবাণু, এবং বেদান্ত দর্শনে ইহার নাম সূক্ষ্মদেহ। প্রাণবীজাণুদেরও ক্রমবিকাশ হয়; তাহারাও নিম্ন হইতে উচ্চ স্তরে বিকাশিত হয়ঃ অজৈব খনিজ পদার্থ হইতে উদ্ভিদ্‌জগৎ, উদ্ভিদ্‌জগৎ হইতে পশুজগৎ এবং এই ভাবে ক্রমশঃ মনুষ্য-জগতে জীবাণুরা অভিব্যক্ত হয়।

বিদেহী আত্মার ক্রমবিকাশ বা নিম্ন হইতে ক্রমিক উচ্চ স্তরে বিকাশের পরিণতি সম্বন্ধে প্লেটো কোন কথাই বলেন নাই, পরন্তু নির্দিষ্ট সংস্কাররূপ গুণ ও পরিমাণবিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহের যে বিকাশ হয়, গুণরূপ সংস্কার বা প্রকৃতির যে কোন পরিবর্তন হয় না একথা প্লেটো স্বীকার করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম সংস্কারের কোন বিকৃতি বা পরিবর্তন হয় না।[১] প্লেটোর ও হিন্দুদের মতবাদ দুইটিকে পৃথক করিয়া দেখাইবার জন্য হিন্দুদের অনুযায়ী দেহান্তরবাদকে 'জন্মান্তরবাদ' বা 'পুনর্জন্মবাদ' বলা যায়। হিন্দুদের অথবা

১। সংস্কারের পরিবর্তন হয় না। সংস্কারই প্রকৃতি বা অব্যক্ত। এই অব্যক্তকে মায়াও বলা হয়। ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতি অবিকৃত থাকে। কিন্তু দিব্যজ্ঞান হইলে প্রকৃতির রূপান্তর; হয় অতএব এ রূপান্তরকে একদিক দিয়া বিকার বা পরিবর্তন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

বেদান্তে বর্ণিত জন্মান্তর এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত লোকান্তর আবার ঠিক একই প্রকৃতির নয়। হিন্দুরা ও বেদান্ত আত্মাকে নিত্য অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল বলেন, কিন্তু বৌদ্ধসাহিত্য আত্মাকে নিত্যও অবিনশ্বর বলিয়া স্বীকার করে না[২] প্লেটো বর্ণিত আত্মস্বরূপের ও বেদান্তে বর্ণিত আত্মসত্ত্বার সঙ্গেও ঠিক মিল নাই। প্রকৃতপক্ষে পুনর্জন্মবাদরূপ নীতি অনুসারে প্রত্যেক আত্মা অর্থাৎ সপ্তদশ অবয়বযুক্ত সূক্ষ্মশরীরের নিম্ন হইতে উচ্চস্তরে ক্রমবিকাশ হয়। আত্মা বা প্রাণবীজ নিম্নস্তরের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ অতিক্রম করিয়া মনুষ্য-জন্ম লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবোচিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সে লাভ করে। মানব-জন্ম লাভ করিয়া বিদেহী আত্মা আর কখনও পশুজন্মে বা পশুদেহে ফিরিয়া যায় না। প্লেটো কিন্তু স্বীকার করেন যে, বিদেহী আত্মা মনুষ্য-শরীর ধারণ করিলেও পশু অথবা দেবদূত, গন্ধর্ব প্রভৃতির শরীরকেও আশ্রয় করিতে পারে এবং তাহার পর পুনরায় সে মনুষ্য-শরীরে ফিরিয়া আসিতে পারে ; অথবা ইচ্ছা করিলে পশুশরীর গ্রহণ করিয়াই সে বহুজন্ম গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারের পরিপ্রেক্ষণে পুনর্জন্মনীতির এই অর্থ বা পরিণতি যুক্তিযুক্তরূপে গণ্য হইতে পারে না। ক্রমবিকাশ বলিতে নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উচ্চস্তরে বিকাশকে স্বীকার করিতে হইবে। প্রাণবীজাণু ক্রমবিকাশের প্রবাহে নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর স্তরের মধ্য দিয়া অবশেষে মনুষ্য-শরীর ধারণ

২। বৌদ্ধদের কোন কোন শাখা আত্মার 'অস্তিত্ব' স্বীকার করে না।

করে, অর্থাৎ মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে প্রাণবীজাণু বা আত্মা বহু প্রাণী জন্মঃ উদ্ভিদ প্রভৃতি বিচিত্র প্রাকৃতিক ও ক্রমবিকাশের প্রবাহ অতিক্রম করে। সুতরাং একবার মনুষ্য-শরীর ধারণ করিলে কেনই বা সে আর নিম্নশ্রেণীর শরীরে জন্ম-গ্রহণ করিবে? তাহা ছাড়া উন্নত বিকাশসম্পন্ন আত্মা কেনই বা নিম্ন বা অনুন্নত বিকাশের স্তরকে বাছিয়া লইবে? নিম্নস্তরের বিকাশও উন্নত স্তরের বিকাশের সহিত যোগসূত্র রচনা করিতে পারে না। তবে এই ধরণের বিকাশ একমাত্র প্লেটোর সমর্থিত দেহান্তরবাদেই সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা যে দেহান্তর তথা জন্মান্তরনীতিকে বিশ্বাস করে, তাহার মতে মনুষ্য-শরীর ধারণ করিবার পর বিদেহী আত্মা আর পশু-শরীরে প্রবেশ করে না; কেননা ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া আমরা পূর্বেই পশু-শরীররূপ নিম্নস্তরের অনেক বিকাশ অতিক্রম করিয়াছি। সুতরাং যেসব অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহাদের পুনরায় বরণ করিব কেন?

তবে ইহাও সত্য যে, ভারতবর্ষে অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তি আছে যাহারা বিশ্বাস করেঃ কর্মফলস্রোতে পড়িয়া অন্যায় ও অসৎ কর্ম করিয়া মানবাত্মা তাহার ক্লেশদায়ক ফল ভোগ করিবার জন্য পুনরায় পশুশরীর ধারণ করে। প্লেটোর বিশ্বাস এবং মতবাদও তাই, তবে প্লেটোর ও হিন্দুদের মতবাদ দুইটিতে পার্থক্য এই যে, হিন্দুরা কর্মফল বা কার্য-কারণসূত্র বিশ্বাস করেন, প্লেটো ইহাদের কোনটাই স্বীকার করেন না। ভারতবর্ষের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মনীষীরা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও বিচারসঙ্গত

সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন। যদিও হিন্দুদের উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে ও ধর্মগ্রন্থে অন্যায় কর্ম করিলে তাহার ফলস্বরূপ মানবাত্মার অধোগতি রূপ পশুশরীর ধারণ করিবার কথাও সাধারণত উল্লেখ আছে, তথাপি উপনিষৎ বা ধর্মশাস্ত্রের ঐ সকল উল্লেখ দ্বারা একথা একেবারে অপরিহার্যরূপে বুঝিতে হইবে না যে, বিদেহী আত্মা অন্যায় কর্ম করিলেও তাহার ফলভোগরূপে পুনরায় পশুশরীর ধারণ করিতে বাধ্য হইবে। কারণ ইহা বিজ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত যে, মনুষ্য-শরীর ধারণ করিলেও জীবাত্মারা নিম্নস্তরের পশুপ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, কেননা মানুষের মধ্যেও কুকুর, বিড়াল, সর্প প্রভৃতির ন্যায় নীচতা ও হিংসা-প্রবৃত্তির বিকাশ দেখিতে পাই। বরং কুকুর, বিড়াল, সর্প প্রভৃতি অপেক্ষা হিংসার ভাব বহু মানুষের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহার দ্বারা এই কথাই বুঝিতে হইবে যে, জীবাত্মারা স্ব স্ব কর্মানুযায়ীই ফল ভোগ করেন। অন্যায় ও নীচ কর্মের ফলরূপে মানুষের আকারে জীবাত্মারা জন্মগ্রহণ করিলেও পশুপ্রবৃত্তির হীনতর প্রকাশও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। এ ধরণের নীচ বা হীন জন্ম গ্রহণ করা সেই সকল জীবাত্মাদের পক্ষেই সম্ভব যাহারা মনুষ্য-শরীর ধারণ করিলেও পূর্ব-পূর্ব জন্মে অন্যায় এবং অসৎ চিন্তা কর্ম করার জন্য তাহারই ফলরূপে পশুর ন্যায় হীন প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা লইয়া জীবন অতিবাহিত করে। তবে এই রকমের নীচ বা হীন প্রবৃত্তির স্তরে নামিয়া আসা যে কোন আত্মার পক্ষে সাময়িক অধোগতিরূপে গণ্য

করিতে হইবে, আর এই অধোগতির দ্বারা তাহার উন্নততর জ্ঞান বা বিকাশের পথ আরও সুগম হয়। তাহা ছাড়া ইহার দ্বারা এ কথাও বেশ বুঝা যায়, আত্মা বা আমাদের ভিতর যে নীচ চিন্তা ও কার্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা আমাদের নিজের বা নিজেদেরই ভুলের পরিণাম বিশেষ।

পাপ কাহাকে বলে? পাপ অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন। পাপ ভুল বা ত্রুটি ছাড়া আর কিছু নয়। এসম্বন্ধে উদাহরণ যেমন অগ্নি যে হস্ত পুড়াইয়া দেয় ইহা না জানা থাকিলেও অগ্নিতে আমি অঙ্গুলি দিলে আমার অঙ্গুলি দগ্ধ হইয়া যাইবে। আর এই যে হস্তের অঙ্গুলি পুড়িয়া গেল ইহা আমার ভুলের জন্য পুড়িল আর এই ভুল আমার অজ্ঞনতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অঙ্গুলি পুড়িবার জন্য আমার এই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানও হইল যে, অগ্নিতে হস্ত দিলে তাহা হস্ত পুড়াইয়া দেয় এবং সেজন্য আর কখনও অগ্নিতে হস্ত দিবার প্রবৃত্তি আমার অন্তরে উদিত হইবে না। সুতরাং ভুল যে মানুষের জীবনে একটি শিক্ষা বিশেষ একথা অতীব সত্য; অর্থাৎ ভুল-ত্রুটী ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে কল্যাণকর ফলই প্রসব করে। মনুষ্যমাত্রেই জীবনে ভুল করে। ভুল অথবা দোষ-ত্রুটী করে না এমন উন্নত বা পরিপূর্ণ মনুষ্য-জীবন জগতে দেখা যায় না। প্রত্যেকটি ভুলের দ্বারা আমরা যখন আবঞ্ছনীয় ফল লাভ করি তখন জগতের মধ্যে যে একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে তাহার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি পড়ে, আমরা তখন সেই নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি সচেতন হই। প্রকৃতপক্ষে একটি

মাত্র জীবনে আমাদের সমস্ত জীবনের শিক্ষা ও পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হয় না, আর সেইজন্যই পার্থিব জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমরা ক্রমবিকাশ ও পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করি। অধ্যাপক হাক্সলিও বলিয়াছেনঃ "অপরিণামদর্শী লোকেরাই অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তার উপর দাঁড়াইয়া পুনর্জন্ম অস্বীকার করে। বাস্তব জগতে বিকাশবাদের ন্যায় লোকান্তরবাদের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে।"